রূপোপজীবিনী।

শ্রীশিবশঙ্কর রায় চৌধুরী

মূল্য এক টাকা।

প্রকাশক

শ্রীশিবশঙ্কর রায় চৌধুরী।

১নং ব্রজগোবিন্দ সাহার লেন।

পাথুরিয়া ঘাট, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—

এম, সি, সরকার এণ্ড সন্‌স্

৯০।২এ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

দি বুক কোম্পানী

কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

সরস্বতী লাইব্রেরী

৯নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ [illegible] রায়।

শ্রীসরস্বতী প্রেস

২৬।১ বেনিয়াটোলা লেন,

কলিকাতা।

ভূমিকা

এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট আমার সর্ব্বপ্রথম রচনা 'দিদির দুঃখ' ও 'হতচ্ছাড়া' শীর্ষক গল্প দুইটি ১৩২৫ সনের প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। 'ভুল' ও '[illegible]' শীর্ষক গল্প দুইটী আনন্দবাজার পত্রিকায় এবং 'ট্র্যাজেডী' গল্পটী বাসন্তী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে সর্ব্ব সমেত সাতটী গল্প নির্ব্বাচিত হইল। তন্মধ্যে দুই একটী গল্পে আমি বিদেশী আখ্যায়িকার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছি। ইতি

১৫ই কার্ত্তিক, ১৩৩০ সাল।
পোঃ নাগরপুর, গ্রাম দুয়াজানী। বড়বাড়ী।
টাঙ্গাইল।

বিনীত
গ্রন্থকার

পরম কল্যানীয়—

শ্রীমান্ প্রাণশঙ্কর রায় চৌধুরী বি, এস্, সি,

করকমলেষু,—

তুমি এখন বিদ্যার্থীর গৌরবময় বেশে সুদূর সমুদ্রের ওপারে। স্বজন বান্ধব হইতে বিচ্ছিন্ন বিচ্ছেদক্লিষ্ট দিনগুলি যাহাতে খুব ভারি বোধ না হয়, যাহাতে বহুদূরবর্ত্তী গৃহের কথা, আমাদের কথা মনে পড়ে এবং সেই অবসাদ ক্লান্তি কথঞ্চিত দূর হয় এই আশায় আমার এই হাতমক্স, সাহিত্যসাধনার অপুষ্ট প্রথম সৃষ্টি,—নিঃসঙ্কোচে তোমারই করে অর্পণ করিলাম। কারণ অন্ততঃ তোমার ভাল লাগিবে এ বিশ্বাস আমার আছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

শ্রী শিবশঙ্কর রায় চৌধুরী

সূচীপত্র

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭০	২	"কাল"	"কান"
৭০	৩	"সমাচীন"	"সমীচীন"
৭১	১০	"নেমতন্ন"	"নেমন্তন্ন"
৭২	১৫	"অনুসরণ"	"অনুরণণ"
৭৫	৩	"চেয়ে"	"যেয়ে"
৭৮	১	"তাপরাশি"	"জলরাশি"
৮০	১৯	"ফিরে"	"ফিরে"
৮৬	৭	"শুন্‌তে"	"শুন্‌তে শুন্‌তে"
৮৬	১৬	"পেলে"	"খুলে"
৯০	৮	"জেঠার"	"সকল"
৯১	২১	"করবো"	"করাবো"
৯৪	৮	"সুরেশের মত ছেলে"	"সুরেশের মত ছেলে। একটি বয়স্কা বোন্ আছে"
১০৩	২	"অপ্রিয়সত্য"	"অপ্রিয় সত্য প্রকাশ"
১০৩	৪	"এতদিন ধরিয়া"	"এতদিন ধরিয়া মিথ্যা"
১১৩	৮	—	(৫)
১১৪	১৯	"সেথ"	"সেট"
১৫৫	১৩	"বড়হয়েইএ"	"বড় হয়েই এ পৃথিবীতে"
১২১	১৫	"এমন"	"এখন"
১২২	১৯	"বাঘের"	"ব্যাঙের"
১২৩	২	"অজ্ঞাত"	"অজ্ঞাতে"

রূপোপজীবিনী

দিদির দুঃখ

মন্দ মধুর বাসন্তী হাওয়ায় ধবল পাল তুলিয়া দিয়া অমল যে লোকে উধাও হইত, দিদি ছিলেন তার নিয়ামক এবং কর্ণধার। রূপকের কথা ছাড়িয়া দিলে দাঁড়ায় এই,—পুত্রসম-বয়স্ক দেবর অমল ও সহচারিণী পিস্‌তুত বোন বাসন্তী যে লোকে বিচরণ করিত, কড়ায়-ক্রান্তিতে তাহাদের কর্ম্মবহুল জীবনের ঘটনা-পরম্পরার ইতিহাস আয়ত্ত করিতে না পারিলেও, কর্ণটির খোঁজ যে তাঁহাকে বিশেষ ভাবে রাখিতে হইত ইহা খাঁটি সত্য।

এই দিদি-জীবটির আসল নামটা যে কি তাহার সন্ধান লইবার বড় একটা কাহারও প্রয়োজন হইত না। বাপের বাড়ীর দেশের ছেলে-মেয়েরা জন্মের পর হইতে তাহাকে দিদি বলিয়াই জানিত এবং শ্বশুরঘরে আসিয়া দেবর ও ননদিনীদের নিকট পর্য্যন্তও আখ্যাটি সমান ভাবেই বজায় রহিয়া গেল;—অবশ্য সেটি কম পুণ্যের কথা নহে।

দদির হৃদয়-কন্দরে দয়ানামক জিনিষটির অস্তিত্ব অনেকেই স্বীকার করিত, কিন্তু কথাটির বনিয়াদ শক্ত ছিল না। তিনি দৈনিক রাজরাণী হইবার যে সংখ্যক আশীর্ব্বাদ পাইতেন, শুনা যায় তাহার অনুপাতে তাঁহার লক্ষ খৃষ্টিয়ানী আচারের যে নিন্দাবাদ —তার ওজন ঢের বেশী। এখানে বলাই বেশীর ভাগ যে খিড়কির পুকুরের সান্ধ্য-সম্মিলনীতে সভ্যাগণ তাহাদিগের ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের মধ্যে যাহা পরিলক্ষণ করেন নাই এমন সমস্ত ব্যাপাররাজির যে সুদীর্ঘ আলোচনা করিতেন দিদির আসন তাহার মধ্যে ছিল না। এই অনুপস্থিত থাকার কারণ যে তাঁর 'বড়মানুষের ঝি'গিরি তথা রূপের গর্ব্ব প্রভৃত 'দেমাক'; এই অতি সহজ কথাগুলি তাহারা 'বিদ্যানী' না হইলেও জলের মত বুঝিয়া ফেলিয়াছিল।

যাহারা অতি সাধারণ লোক তাহারা যেমন চক্ষু বুজিলে কেবল অন্ধকারই দেখিতে পায়, দিদি তেম্‌নি পুরুতঠাকুরের হাতে নৈবেদ্য সাজাইয়া দিয়াই স্বর্গের রাস্তার 'শর্টকাট্' দেখিতে পাইতেন না। অনেক সুযোগ থাকিলেও পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর সলিলে প্রকাশ্য ভাবে গাত্র ধাবনে তাঁহার রুচি ছিল না এবং সেই পুণ্য-সলিল তাঁহার স্বাস্থ্যের পক্ষেও নাকি তেমন অনুকূল হইত না। শুনিতে পাওয়া যায় একবার কি একটা 'যোগের' ফাঁকে যখন কোটি কোটি লোক ফাঁকি দিয়া হঠাৎ বৈকুণ্ঠের দুয়ার আল্‌গা করিয়া লইল, তিনি ছার এই নশ্বর দেহ এবং ততোধিক নশ্বর এই ক্ষণভঙ্গুর স্বাস্থ্যের মোহে এমন একটা সুযোগকে হেলায় হারাইয়াছিলেন। পুণ্যের দিকেও যেমন সাংসারিক দিকেও নাকি তাঁর বুদ্ধির তেমন তারিফ করা যায়

না। কারণ অতি বিচক্ষণ ব্যক্তিরা নানা কারণে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিলেন যে তাঁহার হৃদয়নামক বস্তুটি অতীব 'দ্রবণ-প্রবণ'; শুধু বাক্য দ্বারা চিড়াকে সরস করিয়া লওয়া যায় না, যে দেশে ইহা একটি অতি দামী তত্ব, সেই মাটিতে জন্মগ্রহণ করিলেও নাকি দুইটি বাক্য অথবা দুইবিন্দু লবণাম্বু দ্বারা ঐ প্রাগুক্ত হৃদয়নামক বস্তুটিকে অতি সহজে এবং সুবিধামত বেশ মোলায়েম করিয়া লওয়া যাইত।

দিদির শ্বশুর যখন বাঁচিয়া ছিলেন, তিনি তাঁহার এই ক্ষুদে বৌটির কাছে সংসারের ছোটখাট কাজ হইতে আরম্ভ করিয়া জমিদারীর মাম্‌লা মোকদ্দমার কথা পর্য্যন্ত তুলিতে ছাড়িতেন না। একবার দিদির পরামর্শ-মত একটা মোকদ্দমায় অভাবনীয়রূপে জিত হইলে শত্রুপক্ষ তাঁহার শ্বশুর মহাশয়কে কটাক্ষ করিতে ছাড়িল না। দিদি যথেষ্ট সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেও শ্বশুর মহাশয়ের উৎসাহের কিন্তু কিছুমাত্র হ্রাস হইল না। তিনি কহিলেন, "বলুক না মা, তুমি যে আমার ঘরের লক্ষ্মী তা ত বেটারা জানে না।"

(২)

নিঃসন্তান দিদি যেদিন ও-তরফের ছোট দেবর অমলকে কোলে পাইয়াছিলেন সে দিন তাঁর দুঃখের বেগ অনেকটা মিলাইয়া আসিতেছিল; তার উপর যখন বাসন্তীকে পাইয়াছিলেন তখন তাঁর আনন্দের স্রোত দুজনকে বেড়িয়া হৃদয়ের কূল ছাপাইয়া উছলিয়া উঠিয়াছিল। অনেক দিন পর তাদের দুজনকে একসঙ্গে আবার বুকের কাছে পাইলেন বটে কিন্তু তেমনটি আর বুঝি হইল না।

বাসন্তী ছেলেবেলা হইতে দিদির কাছেই মানুষ হইয়াছিল। দশ বছর পার না হইতেই হাতের নোয়া আর সিঁথির সিঁদুর মুছিয়া ফেলিয়া সঙ্কুচিত ভাবে যেদিন আঙ্গিনার কোণে আসিয়া দাঁড়াইল, দিদি সেদিন গলা চড়াইয়া কাঁদিলেনও না, দুঃখও করিলেন না, কেবল দুই হাতের নিবিড় বেষ্টনের মধ্যে তাকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। ধর্ম্মভীত যে শ্বশুরগৃহে এই অপয়া মেয়েটির স্থান সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, বুঝি তাহারাও ইহার মুখের দিকে চাহিয়া ইহার গায়ে থানের কাপড় জড়াইয়া দিতে পারে নাই। সর্ব্বনাশের কথা এই যে আত্মীয়-স্বজনের সুউচ্চ ক্রন্দনরোলে সমস্ত পাড়াটা সচকিত হইয়া উঠিলেও বাসন্তী তার অবস্থা-বৈপরীত্যে একটুও অসোয়াস্তি অনুভব করিতে পারে নাই, পরন্তু বছর ঘুরিতে না ঘুরিতেই আবার দিদির স্নেহচ্ছায়ার আশ্রয়ে আসিতে পাইয়া তার উৎসাহ আরও বাড়িয়াই গিয়াছিল।

দিদির সহিত বাসন্তীর আকৃতি বা প্রকৃতি কোনটাতেই বিশেষ সাদৃশ্য ছিল না। দিদির যা ছিল বাসন্তীর তা ছিল না, আবার বাসন্তীর মধ্যে যাহা ছিল দিদির মধ্যে হয়ত তার অভাব ঘটিয়াছিল।

দিদির মধ্যে ছিল শরতের আবহাওয়া—শরতের আকাশ শরতের বাতাস প্রকৃতির মুক্ত প্রান্তরে স্নেহময়ী জননীর শ্যাম অঞ্চল বিছানো, আনন্দময়ীর আগমনে চারিদিকে শুধু আনন্দের হিল্লোল, আর তারই সঙ্গে মিশানো যেন বিজয়ার সেই করুণ তান। কোথাও তার চঞ্চলতা নাই, আকাশে মেঘ নাই বিদ্যুৎ নাই আর বসন্তের এলো-মেলো হাওয়াও বুঝি নাই। কিন্তু অপর দিকে, ঋতুরাজ তার

উদ্দামতার প্রতি-কণাটুকু দিয়াই যেন গড়িয়াছিলেন এই বাসন্তীকে। তার হাসির ঝলক, তার তড়িৎ-চঞ্চল চাহনিটুকু, তার তরল গতিভঙ্গী এমন কি তার কলস্বরের মধ্য দিয়াও যেন এমনি চপলতার একটা আভাস ফুটিয়া উঠিত। কিন্তু একখানে যেন তাদের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। মনে হইত একেরই এ-পিঠ আর ও-পিঠ—দুইই যেন মানুষের মনের খোরাকি জোগায় এবং কোনটিকেই যেন একেবারে বাদ দিলে সংসার চলে না।

অমল যখন ছোট ছিল, বাসন্তীর বিয়ের পর তার এই সখীটির বিদায়ক্ষণে এমন কাঁদাকাটি এবং হাঙ্গাম করিয়াছিল যে দিদিকে তখন নানা অছিলায় তাকে সাম্‌লাইতে হইয়াছিল। দিদি তাহাকে যে আশ্বাস দিয়াছিলেন বালক তাহার উপর গভীর আস্থা রাখিয়াছিল; এবং বাসন্তী যে শুধু দুদিনের জন্যই গিয়াছিল এবং আর যে কোনদিন তাহার সঙ্গছাড়া হইবে না—দিদির সেদিনকার এ কথার যাথার্থ্য অনুভব করিয়া সে আজ যথেষ্ট খুসী হইল।

(৩)

রায়পরিবারের বড়বৌ, খেয়ালী এই দিদিটি, অনাচার জীবনে অনেক করিয়াছিলেন। সেদিন যখন হঠাৎ কি ভাবিয়া গায়ের গহনাগুলি একে একে খুলিয়া সিন্ধুকে তুলিয়া রাখিতেছিলেন তখন খবরটি ওবাড়ীর মেজ গিন্নির পাইতে বড় দেরী হইল না। অবশ্য যাহার নিকট পাইলেন সে সেদিনকার বারটির বিষয় এবং এই ব্যাপারটি সম্বন্ধে পাঁজিতে কি বলে তারও উল্লেখ করিতে ভুলে নাই। প্রবীণা গৃহিণীর ইহা বরদাস্ত হইল না। ঘরে তাঁহার

অনেকগুলি কাচ্চা বাচ্চা লইয়া বাস এবং কাহার মনে যে কি তাহাও তিনি অবগত নহেন, কাজেই অতিদ্রুত তিনি ঘর হইতে বাহির হইলেন।

"হ্যাগা বৌ, বরৃত নিয়ম না হয় না-করলেই বাছা, কিন্তু তাই বলে গেরস্ত-ঘরে রোববার দিন গায়ের সোনা খসাতে হবে কোন শাস্তরে আছে বল ত?" গৃহিণী এক নিশ্বাসে অতিঝাঁঝের সহিত কথা কয়টি বলিয়া ফেলিলেন।

দিদি মাথা অবনত করিলেন, তারপর একটু হাসিয়া নীচু গলায় কহিলেন, "হাতে বড় লাগে যে!"

এমন অনাসৃষ্টি কৈফিয়তে কেহই সন্তুষ্ট হইতে পারে না। কিন্তু আদি পিতামহ ব্রহ্মার অতিবড় বৃদ্ধ প্রপিতামহ আসিলেও যে এ কথার নড়চড় হইবে না তাহা সকলেই জানিত। গৃহিণী জোর জোর পা ফেলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

বাসন্তী এবার আসিয়াছে অবধি দিদির মধ্যে হঠাৎ অনেক পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে। বাঙ্গালী গৃহস্থঘরের যতগুলি ব্রতনিয়ম এক আগে একটা একটা করিয়া বা তিনি উচ্ছেদ করিয়াছিলেন ধীরে ধীরে সমস্তগুলিই আবার কাঠোর অনুশাসনের সহিত পালন করিতে আরম্ভ করিলেন, বাসন্তীকেও ছাড় দিলেন না। বাসন্তীর কাঁচা বয়সের উল্লেখ করিয়া অনেকে তাঁহাকে বিরত করিতে চেষ্টা পাইল বটে, কিন্তু তিনি কাহারও কথা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিলেন না। একাদশীর সমস্ত দিনের উপবাসের পর বাসন্তী যখন সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রান্তভাবে এলাইয়া পড়িত, তিনি যেন ইচ্ছা করিয়াই সেদিকে

ফিরিয়াও চাহিতেন না। সেই এলায়িত দেহযষ্টি এক-একদিন যখন ক্লান্তিভারে তাঁহারই অঙ্কে ঢলিয়া পড়িত, তিনি সেই ঘুমন্ত মুখখানি চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেন আর এক-একটি তপ্তশ্বাসের সঙ্গে যেন তাঁহার বুকের এক এক ঝলক রক্ত শুকাইয়া যাইত। অন্যের কাছে তা তো গোপন ছিলই, এমন কি বাসন্তীকেও তিনি তা বুঝিতে দিতেন না।

দিন এমনি চলিতে লাগিল। এই স্বেচ্ছাচারী বৌটার মতিগতি কেন যে এমন করিয়া ফিরিয়া গেল তাহার সন্তোষজনক কোন কারণ খুঁজিয়া না পাইলেও, ধর্ম্ম যে চিরদিনই জাগ্রত আছেন, অবশেষে যে মানুষের সুমতি না হইয়া পারে না, এই মূলতত্ত্বটুকু ধরিতে পারিয়া প্রবীণাদিগের মধ্যে গবেষণামূলক আলোচনা শান্ত হইয়া বাঁচিল।

(৪)

অমলের সহিত বাসন্তীর ছেলেবেলা হইতেই বড় ভাব। দু'জনে একসঙ্গে না মিলিলে সেদিন তাদের খেলা জমিত না। আমের দিনে দু'জনে ভোরে উঠিয়া আম কুড়াইতে যাইত—লভ্যে সন্তুষ্ট না হইলে অমল গাছে উঠিত আর বাসন্তী তলায় থাকিত। তাদের দিনের মধ্যে নূতন করিয়া অনেকবার যে-সব ঝগড়া-ঝাটি হইত দিদি তা মধ্যস্থ হইয়া মিটাইয়া দিতেন। কতবার তাদের জন্মশোধ আড়ি হইত; আবার সেই অতিদীর্ঘ জন্ম-জন্মান্তর সঙ্কীর্ণতম হইয়া ভাব হইতেও বড় বেশী সময় লাগিত না। তারা দুপুরের রোদে পেয়ারা-তলায় থানা দিত, আবার চিলের ছাতে উঠিয়া দিদিকে লুকাইয়া কাসুন্দি সহযোগে অনেক ভদ্ররুচি-বিগর্হিত বস্তু নির্ব্বিচারে পথ্য করিত। দুপুরে তারা একসঙ্গে

সাঁতার কাটিত। কতদিন দিদি তাদের তু'জনকে সমানে দাঁড় করাইয়া শাস্তি দিতেন। কতদিন অমল বাসন্তীর কত অন্যায় আচরণ ঢাকিয়া দ্বিতীয়ভাগের সার অনুশাসনটি অমান্য করিয়া দোষের বোঝাটি নিজের ঘাড়ে চাপাইয়া অতি সহজভাবে অনুচিত শাস্তি মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিত। এই তুইটি কিশোর কিশোরী হাত ধরাধরি করিয়া বিচার-প্রার্থীভাবে দিদির সম্মুখে আসিয়া যখন দাঁড়ায়, দিদির মনটা তখন এমন আলোকিত হইয়া উঠে যে তাঁহার মনের অতিবড় সংযম সত্ত্বেও যেন তাহা তিনি ঢাকিতে পারেন না।

জমিদার-ঘরের ছেলে অমল যোড়শ বর্ষ পার হইতে চলিল, তবু তার বিবাহ হয় নাই; কথাটা লইয়া অমলের মাকে বর্ষীয়সীরা অনুযোগ দিতেও ছাড়িল না। প্রজাপতির দূতগণ বাড়ীতে ঘনঘন পদধূলি দিতে আরম্ভ করিল এবং ফলে নিকটবর্ত্তী এক পাল্টী ঘরে অষ্টম বর্ষের এক বালিকার সহিত শুভকার্য্য পাকা হইয়া গেল।

একথা শুনিয়া অবধি বাসন্তীর আনন্দ আর ধরে না। বিয়ের কথা লইয়া অমলকে সে এক-রকম প্রায় বিব্রত করিয়া তুলিল। কিন্তু অমল বুঝিল তার বিয়ের কথা লইয়া বাদানুবাদ বা হাস্যপরিহাস যেন তার তত ভাল লাগেনা। প্রথম প্রথম সে বাসন্তীকে এড়াইয়া চলিতে লাগিল, তারপর এক দিন হঠাৎ নির্জ্জনে বাসন্তীর হাত তুখানি ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল,—মুখে শুধু এইটুকু বলিতে পারিল, "আমি তোমার কি করেছি!" বাসন্তী কিছুই ভাল করিয়া ঠাহর করিতে পারিল না, কিন্তু একথা বুঝিল এ কণ্ঠস্বর আগে সে শুনে নাই। ঐ কথা ক'টি তার সমস্ত মনখানি জুড়িয়া তাহাকে এলোমেলো কত কি ভাবাইয়া দিল।

অবশেষে সেই শুভদিন আসিয়া পড়িল। সমস্ত বাড়ীময় একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। বাসন্তীও কম সুখী হইল না। সারা বাড়ীময় সে ছুটাছুটি করিতে লাগিল, যেন আজ তার কত কাজ—যেন সে কত ব্যস্ত।

এমন সময় একটি করুণকণ্ঠ তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতেই বাসন্তী সমস্ত ফেলিয়া ছুটিয়া সেইদিকে গেল। দেখিল বিছানার উপর চুপ করিয়া দিদি পড়িয়া রহিয়াছেন আর চোখে তাঁর এক ফোঁটা জল তখনও মুক্তর মত টলটল করিতেছিল। বাসন্তী তাঁর মাথায় হাত দিয়া দেখিল, আগুন। বাসন্তী শিয়রে বসিয়া আস্তে-আস্তে তার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। দিদি তেমনি নীরব রহিলেন। খোলা জানালার মধ্য দিয়া এক-একবার এক এক ঝাপ্‌টা বাহিরের তপ্তবায়ু প্রবেশ করিতেছিল। রসুনচৌকি বিনাইয়া বিনাইয়া করুণকণ্ঠে নিজেকে যেন কাহার পায়ে বিলাইয়া দিয়া ক্রমেই শ্রান্ত হইয়া পড়িতেছিল।

বাসন্তী কহিল, "দিদি, একবার একটু বাইরে যাব? অমলদার যে যাত্রার সময় হয়ে এল?"

দিদি হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "উঃ আমার যে বড় ক্ষিদে পেয়েছে রে।"

বাসন্তী আস্তেব্যস্তে পথ্য তৈরী করিবার জন্য ছুটিল। দিদি বালিশে মাথা গুজিয়া তেমনি পড়িয়া রহিলেন।

দিদি ভাবিতে লাগিলেন। কতদিনের ছোট বড় কত কথা আজ তাঁর মনে পড়িতে লাগিল। বাড়ীর একটিমাত্র প্রাণী অভুক্ত থাকিতে দিদি কোন দিন জলস্পর্শ করিতেন না। বাসন্তী একদিন খাওয়া-দাওয়া সারিয়া মাধ্যাহ্নিক পাড়া-পরিভ্রমণের পরও যখন দেখিল দিদির

খাওয়াই হয় নাই, তখন সে দিদির সঙ্গে ঘটা করিয়া আড়ি পাতিল। সেদিন দিদি দক্ষিণ করে তার চিবুকখানি তুলিয়া লইয়া তাঁর সেই হাস্য-মণ্ডিত মহৈশ্বর্য্যময়ী মুখখানি তার দিকে ফিরাইয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে কহিয়া-ছিলেন, "যদি কোন দিন কোন সংসারের দিদি হবার ভাগ্যি থাকে, তবে এতে যে কি সুখ, তা সেই দিন বুঝ্‌বি, আজ নয়।" দিদি হয়ত তাই পড়িয়া পড়িয়া ভাবিতেছিলেন দিদি হইবার সুখ এবং দিদি হইবার গৌরব কতখানি।

দিদি আজ কিছুতেই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। কেমন করিয়া তাঁর এই ক্ষুদ্র বোনটিকে লোকচক্ষুর অন্তরালে দারুণ অপমানের হাত হইতে রক্ষা করিবেন। ঊনকোটি দেবতার অভিশাপে যে তার জীবন অভিশপ্ত, আজ তার নিশ্বাস লাগিলে যে বরণডালার সমস্ত মঙ্গল-শিখাগুলি অপবিত্রতার ছোয়াচ লাগিয়া ম্লান হইয়া যাইবে—এ কথা দিদি কেমন করিয়া এই অবোধ শিশুটিকে বুঝাইলেন। দিদি আকাশ এবং পাতাল অনেক ভাবিলেন, কিন্তু কুল তার কোথাও মিলিল না।

দ্বারে একটা মৃদু আঘাত হইল 'দিদি'। দিদি উঠিয়া তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া দিলেন। অমল ঘরে ঢুকিয়া চুপ করিয়া একটা প্রণাম করিল, তারপর মাটির দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাড়াইয়া রহিল। বাসন্তীর অনুপস্থিতির ব্যথা যে এই বালকটির বুকে কতখানি বাজিয়াছে তাহা যেন তার এই নীরবতার মধ্য দিয়া স্বতঃই রুদ্ধ আবেগে পরিস্ফুট হইতে চাহিতেছিল, দিদি তাহা বুঝিলেন। দিদির একটু আদরেই তার চোখের জল মুক্ত প্রস্রবণের মত ঝর্ ঝর্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। দিদি তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়া আদর করিয়া তার মুখখানি ঘন ঘন চুম্বনে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া কহিলেন "ওরে অভিমানী, দিদির বুকে তোদের জন্যে যে কতখানি

দুঃখ তা যেদিন বুঝ্‌তে শিখবি, সেদিন দিদির কোন অপরাধই নিবি না।" দিদি আর বলিতে পারিলেন না। হঠাৎ বর্ষণোন্মুখ মেঘ হইতে একপশ্‌লা বৃষ্টি ঝরিয়া পড়িয়া যেন চারিদিকের জমাট কুয়াসাকে একটু পরিষ্কার করিয়া দিল। অমল বাসন্তীর আর কোন খোঁজ না করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আজ বাসন্তীর প্রাণে এই ছোটখাট ঘটনাটি বড় বাজিল। আগে তাদের মধ্যে যে-সব ঝগ্‌ড়াঝাটি বাধিত, অমলই তাহা যাচিয়া ভাঙ্গিত। তাই সে এবারেও ভাবিল। হয়তো এখনই সে আসিবে, কিন্তু অমল আর আসিল না। বাসন্তী উল্টাইয়া পাল্টাইয়া একই কথা অনেক রকম করিয়া ভাবিল। একবার তার মনে হইল দোষ তো তার নিজেরই সম্পূর্ণ, কারণ সারাটা দিনের মধ্যে একবারও সে অমলের খোঁজ লয় নাই। আবার ভাবিল, তা কেন, বাঃ রে, সে কি ইচ্ছা করিয়া এমনটি করিয়াছে? এ কেন সে বুঝিল না। আবার ভাবিল, বেশ তো রাগ করিয়াছে তাতে কার কি? কিন্তু আজ তার মনকে সে কিছুতেই বাগ মানাইতে পারিল না। যখন সে নিজের মনে মনে অনেক বার হার মানিয়া দিদির পথ্য ফেলিয়া অমলের খোঁজে বাহিরে ছুটিল, তখন বাদ্যভাণ্ড লইয়া সমস্ত বরযাত্রী অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে।

(৫)

অমল বিবাহ করিয়া বাড়ী ফিরিল। তার অভিমানের অতি মাত্রায় সে নিজেই অনুতপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু বাসন্তীর রাগ যে এত সহজে পড়িবে তা সেও মনে করে নাই, বাসন্তীও হয়তো না। বাসন্তীর রাগ পড়িল বটে কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে মুখের সে হাসিটুকুও যেন চিরদিনের জন্য নিবিয়া গেল।

অমলের বিয়েতে সে যতখানি উল্লাস আমোদ করিবে ভাবিয়া রাখিয়াছিল তাহা পারিল না। সমস্ত উৎসব কোলাহলের মধ্য হইতে কে যেন তাহার হৃদ্‌পিণ্ডের মাঝখানে কেমন করিয়া সূচিবিদ্ধ করিয়া দিল। এ সম্বন্ধে সে আর মনকে লইয়া কোন বোঝাপড়া করিতে চাহিল না।

নূতন বৌ নোটন মেয়েটি ভারি চমৎকার। বাসন্তীর চেয়ে সে বয়সে অনেক ছোট ছিল এবং বাসন্তী ছোট বোনটির মতই তাকে বুকে তুলিয়া লইল। সে সারাদিন তাকে লইয়াই ব্যস্ত। তাকে ধোয়াইয়া মুছাইয়া দিত, তার চুল বাঁধিয়া দিত, তাকে লেখাপড়া শিখাইত, কখনও বা খুব কড়া ব্যবহার করিত, আবার নির্জ্জনে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া অকারণে কাঁদিত। আকর্ষণ জিনিষটা সংক্রামক এবং তার ছোঁয়াচ নোটনকেও ছাড়িল না।

অমলের সহিত ব্যবহারে বাসন্তীর যেটুকু সঙ্কোচ আসিতেছিল, নোটনের মধ্যস্থতায় বাসন্তী তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল।

একদিন অমল অনেকগুলি ফুল আনিয়া বাসন্তীর কোঁচড়ে ফেলিয়া দিল। আশা তার ব্যর্থ হইল,—চিরদিনের বন্ধুত্বের(?) যত্নগ্রথিত মাল্যখানি আর তার ভাগ্যে মিলিল না। এবার বাসন্তী সেই ফুলের বলয় কঙ্কণ গড়িয়া পরিপাটিরূপে নোটনকে সাজাইয়া অমলের সম্মুখে আনিল, অমল পলাইবার পথ পাইল না।

বাসন্তীর এই দ্বিধাশূন্য ভাববৈচিত্র্যহীন ব্যবহারে অমল মনে-মনে সুখী হইতে পারিল না। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দার্শনিক ভাবে চিন্তা করিল, "হায় নারীর মন জিনিষটা কি সত্য-সত্যই এমনি হাল্কা, এমনি অপদার্থ।"

বালিকাপত্নী নোটনকে একদিন একটু বেশী আদর করিয়া অমল

ব্যথিত কণ্ঠে কহিল, "নোটন, আমি বুঝি তোমায় তেমন করে ভালবাসতে পারি না।" নোটন এ কথায় অতিমাত্র বিস্মিত হইল। এমন কথা তো সে কোনদিন তার স্বামীর মুখে শুনে নাই। আর তেমন কথা যে কাহাকেও কটাক্ষ করিয়া হইতে পারে সেই সরলা নির্ব্বোধ বালিকা তাহা মনেও আনিতে পারিল না। ইহার চেয়ে মানুষ আর মানুষকে কত বেশী ভালবাসিতে পারে তাও ত তার জানা নাই। যখন প্রসঙ্গটি আরও একটু স্পষ্ট হইয়া পড়িল তখন যেন হেলাভরেই সে কহিল, "ওগো, কে আপন কে পর তা আর তোমায় নূতন করে চিনিয়ে দিতে হবে না।" তেমনি সহজ-গতিতে হাসিতে হাসিতে নোটন চলিয়া গেল। এই ক্ষুদ্র বালিকার সরলতার সম্মুখে নিজের দুর্ব্বলতার আঘাতে সে নিজেই পীড়িত ও লজ্জিত হইয়া পড়িল। অকস্মাৎ পরদিন ব্যস্ত হইয়া তার কোন এক বিদ্রোহী মহালের তদন্তের জন্য অমল বাড়ী হইতে চলিয়া গেল। দিদি বাধা দিলেন না, কাজেই নোটনও নীরব রহিল। বাসন্তীও কোনো কথা কহিল না।

(৬)

এদিকে যেন কারণ বিনাই বসন্তের এ লতিকাটি ক্রমেই শুকাইতে লাগিল। দিন দিনই অস্তমান শশীকলার মত ক্ষীণ হইয়া বাসন্তী শয্যা-গ্রহণ করিল। ভিষকপ্রবর বাছিয়া-বাছিয়া অনেক তুখড় ঔষধ প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু ফলে কিছুই হইল না। অমল তখনও মহালে। বাসন্তীর বহু নিষেধসত্ত্বেও নোটন অমলকে তার পীড়ার সংবাদ না দিয়া থাকিতে পারিল না, কিন্তু তবু অমলের কোনই সাড়া পাওয়া গেল না। দিদি নিশিদিন বাসন্তীকে বুকে করিয়াই রাখিলেন। তারপর যখন একদিন বুঝিলেন সময় ক্রমেই নিকট হইয়া আসিতেছে তখন তাহাকে আবেগভরে চুম্বন করিয়া

কহিলেন, "বাসন্তী রে, জগতে হলেও-হ'তে-পারত এর চেয়ে করুণ কথা আর কিছু নেই। তোর দিদিকে তুই যত বড় করেই দেখিস্ না কেন, আজ সত্যিই বলছি অতি-অযোগ্য। অন্তরে যে কথা হাজারবার ফুলে ফুলে উঠেছে বাইরে, তা কাজে দেখাতে পারেনি। আমি যে তোর কাছে কত অপরাধী, সে আমি তোকে বোঝাতে পারবো না, যদি অন্তরতম কেউ থাকেন তবে তিনিই জানেন। বল বোন, দিদিকে এত অক্ষমা জেনে তার কোন অপরাধই নিলি না—" দিদির কণ্ঠ ধরিয়া আসিল। বাসন্তীর চোখ দুইটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সেই ম্লানমুখে একটি স্নিগ্ধ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল,—সেই কি ক্ষমা?

নোটন পাগলের মত তার বুকে আছাড়িয়া পড়িয়া কহিল, "দিদি কি দোষে আমাদের ছেড়ে যাচ্ছ দিদি?" বাসন্তী তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া স্নেহগদগদ কণ্ঠে কহিল, "আমি বড় অকৃতজ্ঞ ছিলাম রে নোটন! অনেক পেয়েও নিজেকে বঞ্চিতা মনে করেছিলাম, তাই ভগবান আমার সে অপরাধ ক্ষমা করলেন না।" ক্ষণেক থামিয়া যেন একটু বল সংগ্রহ করিয়া কহিল, "নোটন, বোন, আজ আমি কায়মনে আশীর্ব্বাদ করে যাচ্ছি তুই যেন সুখী হতে পারিস্।" তারপর বাড়ীর সকলের নিকট একে একে বিদায় লইয়া আনমনে দুই-একবার দ্বারের দিকে চাহিয়া বাসন্তী শ্রান্তিভরে গভীর সুষুপ্তির ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িল—পিছনের অনেক কান্নাকাটি অনেক ডাক হাক পিছনেই পড়িয়া রহিল—বাসন্তী একবার ফিরিয়াও তাকাইল না।

বাসন্তী মরিয়া গিয়াছে। রায়-বাবুদের পুরাতন সংসার তেমনি

নিয়মিত চলিতেছে। কেউবা তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছে, কাহারও বা মনের কোনে এতটুকু স্মৃতি ধুক্‌ধুক্ করিয়া জ্বলিতেছে।

এমনি একদিনে, বর্ষার এক মধ্যাহ্নে যখন বাহিরে ঝুপঝাপ জলের ধারা একটা কাহার বিরাট কান্নার মত নিঝোরে ঝরিয়া পড়িতেছিল, দিদি কি মনে করিয়া বাসন্তীর অতি যত্নে রক্ষিত ভাঙ্গা তোরঙ্গটির ডালা আস্তে আস্তে খুলিয়া ফেলিলেন—তার মধ্যে কিশোর অন্তরের কত গোপন কথা! পুতুলের কাপড়, পুতুলের জামা, খানকয়েক ভাঙ্গা কাঁচ, গোটা দুই লাটিম, মরিচাপড়া একখানা ছুরি—আরও এমনি কত কি! সকলের নীচে কাপড়ের ভাজের মধ্য হইতে বাহির হইল একখানা পুরাতন খাতা। দিদি খুলিয়া দেখিলেন তা যে বাসন্তীরই হাতের বাঁকা ছাদের অক্ষরে ভরা। দিদির মনে হইতে লাগিল এ যেন সেদিনের কথা, এই ত কেবল সেদিন। তাঁর মনে হইল যেন বাসন্তী পাড়া ঘুরিয়া এখনি আসিয়া পড়িবে, আসিয়া আবার তেমনি করিয়া দিদি বলিয়া ডাকিবে।

খাতাখানি লইয়া আনমনে নাড়াচাড়া করিতে করিতে হঠাৎ একটা জায়গায় চোখ পড়িতেই দিদি চম্‌কাইয়া উঠিলেন। লেখা রহিয়াছে, "* * * * কপাল যখন আমার পুড়েছিল, কৈ তখনকার কথা তো আমার কিছুই মনে পড়ে না, এমনকি যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল তার কথাও তো আমার কিছুই মনে নাই। সে কথা না মনে পড়াতে তো আমার দুঃখ ছিল না যদি আমি তোমায় না দেখতাম। দিদি রে, তোর সমুদ্রের মত অগাধ ভালবাসা দিয়েও কি একজনের শূন্য ঠাই পূরণ করতে পারিস না?"

আর-এক জায়গায়, "* * তুমি ভাবছ হয়ত স্ত্রীলোকের মন এমনি অসার আর এমনি পাষাণ। তা তুমি ভাবতে পার। হারে অবোধ

পুরুষ জাতি, এইটুকু বিশ্বাস নিয়ে তোমাদের কারবার! যদি পাথরই হয়ে থাকি সেখানে একবার দাগ বস্‌লে সে যে কোন দিনই মুছে না। *

আর এক স্থানে,—"* * নোটন সে যে অনিন্দ্যশুভ্র একটি শ্বেতপদ্ম, সে যে আমার দুধের বালিকা, সে যে আমার ছোট্ট বোনটি, সে আমার কি করিয়াছে,—হে ঠাকুর আমার মন ভাল করিয়া দাও ঠাকুর; * *"

সর্ব্বশেষে দিদির যেখানে চক্ষু বসিল সেখানটা এইরূপ, "* * * নিজেকে বলি দিতেই হবে। সমাজের ভয় আমি করি না, আমি যে চিরদিনের সেই অশান্ত দস্যি মেয়ে। আর আনাচে কানাচে কে কি কানাকানি করে তাই শুনে যে-মানুষ নিজের জীবনের সকল আকাঙ্ক্ষা সকল কামনা ছাড়্‌তে পারে, সে মানুষ আমি নই। নোটন আমার প্রাণের নোটন, এসে পথে দাঁড়াল যে। তবুও বলি, এপারে আর তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল না, ও-পারের অপেক্ষা করতে পার? যদি পার তবে আবার দেখা দিও। সে আশা কি এতই অপূরনীয়? আমি তো তা মনে করিনা। * * *"

দিদি আর পড়িলেন না, খাতাখানি ধীরে-ধীরে বুজাইলেন। তাঁহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল।

তারপর সকলের অজ্ঞাতে লোকচক্ষুর অন্তরালে একদিন গঙ্গার জলে তাহা ভাসাইয়া দিলেন।

কিন্তু একটি সন্দেহ তার কিছুতেই গেল না। একটি আধফুটন্ত জীবন-কলি যখন অকালে এম্‌নি করিয়া ঝরিয়া পড়ে সে কি সেই বিশ্বনিয়ন্তারই কৌতুক খেয়াল, অথবা মানুষই তাকে জোর করিয়া ঝরাইয়া ফেলে বলিয়া!

হতচ্ছাড়া

জুজুর নামে ভয় পায় না এমন ছেলে-মেয়ে বাংলাদেশে বেশী মিলে না, আবার দুই একটা নষ্ট ছেলে জুজুকে প্রত্যক্ষ করিতেও চাহে। খতাইয়া দেখিলে মুখুজ্যেদের বাড়ীর ফটিকচাঁদ হয়ত শেষোক্ত পর্য্যায়েই পড়িবে।

তিলফুল জিনি নাসা এবং চম্পক জিনিয়া বর্ণ, এক কথায় আখ্যায়িকার নায়কের পক্ষে যাহা একান্ত না হইলেই নয় এমন সব বালাই ফটিকচাঁদের ভিতর ছিল কি না খবর রাখি না;—তবে তাহার পেশীবহুল আঁটাসাটা দেহ, মাথায় একরাশ ঝাক্‌ড়া চুল আর বড় বড় দুইটি চক্ষুর কৃষ্ণ তারকার মধ্যে এমন কিছু ছিল যাহা এই বাংলা দেশে একটু বিশেষ করিয়া চোখে ঠেকে। বৈদিক পিতামহগণ হইতে তাঁহাদের ধ্যানস্তিমিত নেত্রের নিস্পন্দতার পূর্ণতম অংশটুকু যে আমরাই বিশেষ করিয়া উত্তরাধিকার-সূত্রে পাইয়াছি তাহা সম্পূর্ণ মানিলেও মুখুজ্যেদের ফটিকচাঁদ কেমন করিয়া যে সেই নিজস্ব পরম সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইল তাহা বুঝিতে পারি না।

সত্য কথা সরলভাবে স্বীকার করিলে ফটিকচাদকে তাহার পাঠ্যপুথির সুবোধের মত সুশীল আখ্যা দেওয়া চলে না।

বাগ্দেবীর সহিত সম্যক পরিচয় করিতে হইলে অস্মদ্দেশে যে দৌবারিক-টির স্মরণাপন্ন হইতে হয়, তাঁহার হ্রস্বায়মান বেতসী যষ্টিখানা ফটিকের তেমন উপকারে আসিল না। বর্ণমালার 'ক' এবং 'খ'এর মধ্যে কি যে

২

ছাই পার্থক্য তাহা সেদিন অনেক চিন্তা করিয়াও ফটিকচাঁদ ঠাহর করিতে পারিল না। জীবনীসংগ্রাহক ইহা হইতে ভবিষ্যৎ জীবনে তাহার সাম্য-দর্শনের প্রামাণ্য উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিলেও, আত্মীয়স্বজন মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করিতে পারিলেন না। এবং অবশেষে ইহা স্পষ্ট অবধারিত হইল যে বিধাতা তাহার অতিবড় মস্তকের মগজের অভাবটুকু কোন এক অতি পবিত্র গব্য দ্বারা পূরণ করিয়া দিয়াছিলেন।

এইরূপে সকলেই যখন হাল ছাড়িল, ফটিকচাঁদ তখন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

পাঠশালার চারিটি বেড়ার গণ্ডী হইতে যে দিন ফটিকচাঁদ নিজেকে মুক্ত মনে করিল, সে দিন তাহার জীবনে একটি বিশেষ আনন্দের দিন। মুক্তির আনন্দ তাহাকে এতই পাইয়া বসিল যে তাহার ভাগ্যের উপরওয়ালা তাহার অতি দুর-সম্পর্কীয়া পিসিরূপ জীর্ণ বাঁধনটিও ছিন্ন করিয়া দিলেন।

পাড়াগাঁয়ে একটা সুবিধা এই যে সৃষ্টিকর্ত্তা যাহাকে আত্মজন হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন এমন লোকের কেবল মাত্র বোধ হয় অহেতুক স্নেহের টানেই আত্মীয় বান্ধব অনেক জুটে। ফলে, ব্যক্তি-বিশেষের না হইয়া বেওয়ারিশী ভাবে সে গ্রামের সর্ব্বসাধারণের হইয়া দাঁড়ায়। আত্মীয়তার বোঝাই তখন তাহাকে কেবল বহিতে হয় না, আনুসঙ্গিক ছোটখাট দুই একটা ফাই-ফরমাস হইতে আরম্ভ করিয়া ধান-চালের বড় বড় বস্তাগুলিও ক্রমে মাথায় চাপিতে থাকে। এবং সমর্থ বয়সে না খাটিতে শিখিলে ভবিষ্যৎ যে কত অন্ধকার এই সমস্ত অমূল্য উপদেশ শুধু আত্মীয়তার খাতিরেই ও তাহার অতিবড় হিত করিবার উদ্দেশ্যেই বর্ষিত হইয়া থাকে।

যাহা হউক, ও পাড়ার মাতব্বর তারাচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় একদিন

হিসাব করিয়া দেখিলেন যে যেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে তাহাতে চাকরটির খোরাক ও মাহিয়ানা অতি অতিরিক্ত। কাজেই এমন একজন আত্মীয়ের তাঁহার বড়ই প্রয়োজন হইল যে তাঁহাকে চাকর পোষার দায় হইতে সহজেই মুক্তি দিতে পারে, এবং একদিন এই বৃদ্ধের বাৎসল্যরস উথলিয়া উঠিয়া সহসা ফটিকচাঁদকে অভিষিক্ত করিতে চাহিল। সুযোগমত একদিন তাহাকে নির্জ্জনে পাইয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় যে তাহার পর নহেন এবং কি সম্পর্কে যে কি হয়েন তাহা বিশেষ করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন। কাজকর্ম্ম? আরে রামঃ। ছোট ছোট ছেলে পিলেদের একটু দেখা শুনা—আরি সে কথা বলতেই বা হবে কেন; গরু কয়টাকে একটু নাড়াচাড়া—আরে সে ত পরলোকের কাজ, সে আর কয় জনের ভাগ্যে হয়; ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ইহা বলাই বাহুল্য যে স্বেচ্ছাচারী ফটিকচাঁদ এই নিছক স্নেহের টান তেমন জোর করিয়া প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে পারিল না। ফলে, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মুখ হইতে যে সব ভাষণ বাহির হইল তাহাকে আর যাহাই হউক সু বলা চলে না। দুঃখের বিষয় এই বকাটে ছেলেটার সেজন্য একটুও আপশোষ হইতে দেখা গেল না।

অতি শৈশব হইতেই যখন ফটিক দেখিল যে গায়ে বুদ্ধিমান বলিয়া যাহাদের খ্যাতি তাহারা তাহার স্থান গোল্লারূপ কোন এক অপূর্ব্ব লোকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া বেশ নিশ্চিন্ত, তখন তাহার জীবনটাও কেমন ঐ এক ভাবে গঠিত হইয়া উঠিতে লাগিল যেখানে কোনরূপ শাসন মানিয়া চলা জিনিসটার স্থান একেবারেই নাই। সংক্ষেপে ইহাই উত্তর কালের হতচ্ছাড়া ফটিক ঠাকুরের আত্মলীলা।

(২)

বাল্যে দৈবজ্ঞঠাকুর ফটিকের জন্ম লগ্ন মিলাইয়া তাহার অদৃষ্টের যে ফর্দ্দ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে মর্ত্ত্যজীব মনুষ্যত ছার, সদা ভ্রাম্যমান ব্যোমচারী গ্রহ উপগ্রহগণও যে তাহার উপর বিশেষ প্রসন্ন ছিল না তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ দর্শাইয়াছিলেন। ফটিক ঠাকুরের ইহা অজ্ঞাত ছিল না, এবং অজ্ঞাত ছিল না বলিয়াই হয়ত স্বভাবকুটিল নিয়তির গতিরোধ করিতে কোন দিন কোন চেষ্টাও সে পায় নাই। অদৃষ্টের চাকাটা তাহার আগে আগে আপন নির্দ্দিষ্টপথে ছুটিতেছিল আর ফটিক ঠাকুর একেবারে নির্ব্বিকারচিত্তে স্রোতে-টানা খড়কুটার মত বেশ একটানা ভাসিয়া চলিতেছিল। উদ্দাম দুই একটি তরঙ্গের প্রবল আঘাত আসিয়া কোন দিন তাহাকে একটুকুও চঞ্চল করে নাই এমন কথা বলিতে পারি না, কিন্তু ফটিক ঠাকুর তাহার পাথরের মত ধৈর্য্যের বাঁধ দিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া আবার তেমনি দ্বিধাশূন্যচিত্তে সমানভাবে তাহার অনুসরণ করিয়াছে। এইরূপে ফটিকঠাকুর তাহার জীবনের ত্রিশটি বৎসর অনায়াসে পশ্চাতে ফেলিল।

বাধাহীন ফটিক ঠাকুরের এইরূপ চলিবার পথে কোনরূপ অসুবিধাও ছিল না, কারণ তাহার অদৃষ্টের দেবতাটি বাঁধনের দড়াদাড়ি আগে হইতেই বেশ পরিষ্কার করিয়া কাটিয়া রাখিয়াছিলেন। ভগবান তাহাকে মুক্তি দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু স্বভাবটা তাহার ছিল এমনি কু যে ভগবানের বিধানের উপরও কারিকুরি খাটাইতে সে চাহিত। বেকার জীবনটা তাহার শেষে আশ্রয় পাইল তাহার মতন বেকারদের সেবায়। যতরাজ্যের লক্ষ্মীছাড়া ও হতভাগ্যদের লইয়াই দেন তাহার কারবার। ওপাড়ার

নাপিত-বুড়ীকে ত দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবার না দেখিলেই নয়, কারণ কবে বুড়ী মরিয়া ঘরের ভিতর পচিয়া থাকিবে আর পরে তাহাকেই ত তাহা কাঁধে করিতে হইবে। একঘরে হইলে কি হয়, আহা উমাপদ ঘোষ যে বড় গরীব। মড়াপোড়ার ঘাটে ত তার থাকা চাই-ই। উঃ, সেবার কামার-খুড়ার বিধবা মেয়েটা ক্ষোভে দুঃখে গলায় দড়ি দিয়াছিল; সে হতভাগিনীর জীবনের সে করুণ ইতিহাসটি সে কি আর এত সহজেই ভুলিতে পারে, সে যে তাহার পাথরের মত হৃদয়ের পাতেও চিরদিনের তরে একটা রেখাপাত করিয়া গিয়াছে। কলঙ্কিতার মৃতদেহটা স্পর্শ করিয়া পাপ সঞ্চয় করিবার মত লোক যখন একজনও মিলিল না, বখাটের সেরা এই ফটিক ঠাকুরই যে তখন কোথা হইতে আসিয়া জুটিয়া পড়িয়াছিল। বামুনের ছেলে হইয়াও যত ছোটলোক ইতরের সঙ্গে যাহার সৌহৃদ্য ও সম্পর্ক, আর ডোম-মুদ্দোফরাসের কাজই যাহার পেশা, এহেন ফটিক ঠাকুরকে দুঃখী পতিত আর নিরাশ্রয় ছাড়া আর কাহারও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু লোকের 'অনুরাগ' ছিল তাহার উপর যথেষ্টই। ইহাতে তাহার বড় কিছু আসিয়া যাইত না, কারণ সংসারে সে ছিল একা এবং পীড়ন সহিবার ও না দমিবার শক্তি তাহার ছিল প্রচণ্ড। সে যে কেন বিবাহ করে নাই এবং বিবাহের উপর তাহার কোনরূপ বীতশ্রদ্ধা ছিল কি না তাহা স্বরূপ বলিতে পারিব না; তবে মনে হয় হয়ত সে নিজকে এতদিনে পাঁচজনের মাপকাঠিতে চিনিতে শিখিয়াছিল এবং হয়ত খামাখা অসহায়া নির্দ্দোষ একটি বালিকার অদৃষ্টকে নিজ অদৃষ্টের সহিত যুক্ত করিয়া চিরদিনের মত ভারাক্রান্ত করিতে তাহার মন সরে নাই।

(৩)

পাড়ার বহুদর্শী লোকেরা ফটিক ঠাকুরের জন্য যে লোকের ব্যবস্থা করিয়াছিল সেই অভিমুখে সে কতখানি বেগে অগ্রসর হইতেছিল তাহা দেখিবার তাহার সময়ই হইল না যে দিন হইতে তাহার মজুর বৃদ্ধ করিম মিঞার ফুলের কুঁড়ির মত ছোট্ট নাতনিটি আসিয়া তাহার কোলকে কায়েমী করিয়া তুলিল।

বাড়ীতে সকলে তাহাকে ফুলি বলিয়া ডাকিত। তবে তাহার নামটি যে ঠিক কি ছিল ফটিক ঠাকুর তাহা অনেক ভাবিয়াও নির্ণয় করিতে পারিল না। তাই সে নূতন নামকরণ করিল 'ফুল'।

ফুল বড় হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া ফটিক ঠাকুরের ভাবনা হইল ফুলকে লেখাপড়া শিখাইবে সে কেমন করিয়া? তখন সে বই কিনিয়া নিজেই লেখাপড়া শিখিতে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেল।

তাহার ফুল যখন ক্রমে এক পা দুই পা করিয়া চলিতে শিখিল তখন হইতেই সে নিয়তই তাহার কোলের পুঁথি টানিয়া, ছবির পাতা উল্টাইয়া তাহার নিঃসঙ্গ অবসন্ন জীবনটাকে যেন সজীব করিয়া তুলিল।

ক্রমে সে বড় হইল, তাহাদের সমাজের রীতি অনুসারে অন্তঃপুর ছাড়িয়া বাহিরে আসিবার বয়স তাহার পার হইয়া গেল, তবুও তাহার এই মূক সঙ্গহীন দাদাটীর সঙ্গ ছাড়িবার কথা সে কোনদিন ভাবিতে পারিল না, এবং বৃদ্ধ করিম মিঞাও ইহাতে দোষ দেখিতে পাইল না। দুপুর বেলায় ছোট্ট মাদুরটি পাতিয়া শ্লেট্ পেন্সিল লইয়া কেবলমাত্র তাহার দাদাটিকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই যখন সে না জানি কত মনোযোগী ছাত্রীর মত অধ্যয়নে আসক্তি দেখাইত, ফটিক ঠাকুর তখন মধ্যে মধ্যে

নিজের পড়া বন্ধ করিয়া তাহার সেই স্নেহনিবিড় মুখখানি চাহিয়া চাহিয়া দেখিত।

চির উদাসীন ফটিকঠাকুরের অবস্থা এমনতর হইয়া পড়িল যে তাহার নিজেরসংসারের কোথায় যে কি আছে তাহাও ক্রমে তাহার জ্ঞানের বাহিরে যাইয়া পড়িতে লাগিল। এবং এ-সময় ও-সময়, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে, তাহার ফুলের দুইটি নিপুণ হাতের সোনার কাঠির পরশ ছাড়া যেন তাহার সংসার অচল হইয়া পড়িবে এমন সম্ভাবনা দেখাইতে লাগিল।

সময় ও সংসার কাহারও সুবিধা অসুবিধা মানিয়া চলে না। যে ফুল একদিন ভাবিয়া রাখিয়াছিল তাহার এই অসহায় দাদাটিকে ফেলিয়া সে কোথাও যাইতে পারিবে না, নির্মম বাস্তব জগতে নামিয়া সে দেখিল তাহার সেই ফটিকদার উপর যে স্নেহ নিষ্ঠা ও ভক্তি বুঝি তাহাই মায়িক, বুঝি তাহাই অসত্য। অর্থাৎ এক শুভক্ষণে তাহার বিবাহ হইয়া গেল এবং সত্য সত্যই কত সুখে দুঃখে স্নেহে মমতায় ঘেরা, শৈশবের কত হাসি কান্নায় জড়ানো, সেই চিরপুরাতন অথচ চির মধুময় আবাস ছাড়িয়া কোন্ অচেনা অজানার উদ্দেশে তাহাকে যাত্রা করিতে হইল।

গন্ধময় ফটিকঠাকুর চির অভ্যস্তের মত আবার তাহার সেই পুরাতন পরিত্যক্ত পুঁথিগুলির ধুলা ঝাড়িতে লাগিয়া গেল। এবং আবার সেই কাহার কিসের অন্নঘটন, কাহার বাড়ীতে দুই ক্রোশ দূর হইতে দুপুর রাত্রে বৈদ্য ডাকিতে হইবে, এই লইয়া ভবঘুরে ফটিকঠাকুরের সেই সনাতন কবিত্বহীন জীবন বেশ চলিতে আরম্ভ করিল।

(৪)

সে বছর বৈশাখ মাসে গরমও পড়িয়াছিল যেমন অতিরিক্ত আর

খাল বিল শুকাইয়া চাষীদের জলকষ্টও হইয়াছিল তেমনি। সাথের সাথী বিসূচিকাদেবী ক্ষুদ্র তগাজানি গ্রামটির মুসলমানপাড়া জুড়িয়া নিত্য প্রতাপ জারি করিতে কসুর করিলেন না। চারিদিকে একটা হাহাকার পড়িয়া গেল। শবদেহগুলি মাঠ ঘাট পূর্ণ করিয়া তাহাদের পলকহীন বিস্ফারিত দৃষ্টি আকাশের দিকে তুলিয়া দুঃখ-বেদনার কাহিনী কাহার পায়ে নিবেদন করিয়া নিঃস্রোতা ক্ষীণা লৌহজংএর জলে ভাসিতে এবং পচিতে লাগিল।

করিম মিঞার রোগের সংবাদ যখন ফটিক ঠাকুরের নিকট পৌছিল, সেই অবধি যে নীরবে এই দুঃস্থ পরিবারের পার্শ্বে আসিয়া দাড়াইল এবং মৃত্যুর দেবতার সহিত প্রাণপণে এমন যুঝিল যে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও সে ভঙ্গ দিল না। মৃত্যুযন্ত্রণাময় এক চিন্তা যখন শ্রান্ত বৃদ্ধকে ক্ষণেকের জন্যও সোয়াস্তি দিতেছিল না, সেই সঙ্কট মুহূর্ত্তে তাহার হতাশ দুইটি চক্ষু যাহার উপর পড়িল এবং যাহার উপর পূর্ণ নির্ভর খুঁজিল তিনি আকাশের কোন দেবতা নহেন। মুখে কিছু না বলিতে পারিলেও একটা অসীম নির্ভর ও একটা তৃপ্তির নিশ্বাস পশ্চাতে ফেলিয়া করিম মিঞা চক্ষু মুদিল।

এই রোগের আক্রমণে করিম মিঞার দুই পুত্র পত্নী ও জামাতা ইহলোক হইতে বিদায় লইল। তালিকায় বাকী থাকিল জরাজীর্ণা অতি বৃদ্ধা মাতা ও ছিন্নমুকুলের মত সদ্যবিধবা ষোড়শবর্ষীয়া নাতনী ফুলি। ফটিকঠাকুরের মনটাই ছিল এমন যে দুঃখ দেখিলেই প্রাণে বাজিত, বড় ও ছোটর তারতম্য তাহার মনে স্থান পাইত না। বোধ হয় সেই কারণেই তাহার ফুলের জন্যও তাহার প্রাণে দয়ার অভাব হইল না।

সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া কুলি যেদিন পথে দাঁড়াইল, ফটিকঠাকুর তাঁহার দুই স্নেহকর বাড়াইয়া সেই দুঃসহ ভার তুল্যাংশে বাঁটিয়া লইল।

বছরের ঢেউয়ের সঙ্গে কুলির মুখে আবার হাসি দেখা দিল। আবার সেই একে একে তাহার দাদার এলোমেলো সংসারটি গুছাইয়া হাতে তুলিয়া লইল। আবার সেই শৈশবের অতি বাধ্য বোন্‌টির মত তাহার পুঁথিপত্র গুছাইয়া দিতে লাগিল, তাহার নিকট হইতে পড়া বুঝাইয়া লইতে লাগিল। কুলিদের বাড়ী হইতে ফটিক ঠাকুরের ঘর বেশী দূর ছিল না, কেবল মাঝখানে একটা ছোট্ট বাগানের মত একটা বাঁশঝাড় পার হইতে হইত। উভয়ের বাড়ীই গ্রামের এক সীমান্তে ছিল, কাজেই লোকে তখনও এ সম্বন্ধে তেমন চিন্তা করিবার অবসর পায় নাই। কিন্তু বুঝি গ্রহ-উপগ্রহদের কড়া নজর তখনও ফটিকঠাকুরের অদৃষ্টকে আচ্ছন্ন করিয়াই ছিল!

(৫)

এই নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তিটি মাঝে আসিয়া না পড়িলে দেবদ্বিজে ভক্তিমান্‌ পরম বৈষ্ণব মৃগাঙ্ক বাবুর ক্ষুদ্র সাধটি যে ততদিন অপূর্ণ থাকিয়া যাইত না একথা যেদিন পাইকের সেরা কৈলাস চাঁড়াল আসিয়া নানা বর্ণনা সহকারে বিবৃত করিল সেদিন প্রবল পরাক্রান্ত জমিদার-বাবুর মস্তকের ভিতর যে ভাবোদ্রেক হইল হয়ত তাহা নিতান্ত সদিচ্ছা-প্রণোদিত নহে।

পরদিবস ঠিক খড়ের ঘরে আগুণের মত বৈঠকখানায় চণ্ডীমণ্ডপে এবং স্নানের ঘাটে এমন একটি রুচিকর সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া পড়িল যে টীকা টিপ্পনীর জের মিটিতে সপ্তাহখানেকেরও বেশী লাগিয়া গেল।

এই সব পাপের আলোচনায় যখন লোকের ধর্ম্মকর্ম্ম প্রায় বন্ধ হইয়া

আসিবার জোগাড় হইল, তখন একদিন চৌধুরীবাবুদের • ব্রজেন্দ্রবাবুর পাশার আড্ডায় গ্রামের গণ্যমান্য মুরুব্বি লোকেরা প্রতিকারের জন্য সমবেত হইলেন। নানা হট্টগোল চলিতে লাগিল, যাহার যেরূপ অভিরুচি এবং অভিজ্ঞতা সে সেইরূপই বলিতে লাগিল। দিন দিন গরুর দুগ্ধ যে কেন কমিয়া যাইতেছে, ধরিত্রীদেবী যে কেন আগের মত শস্য দান করেন না, কলির পরমায়ু কেন ক্রমেই ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে, তাহার অকাট্য কারণ আলোচিত হইল। উপসংহারে চাটুজ্যে মহাশয় এইরূপ পাপ এবং অনাচারের ভার দেবী বসুন্ধরা যে সেদিন পর্য্যন্তও কেমন করিয়া বহন করিতেছেন সে সম্বন্ধে যথেষ্ট বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। যাহা হউক সভাভঙ্গের পূর্ব্বেই ফটিক ঠাকুর সমাজচ্যুত হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন্ অশুভক্ষণে যে জাতি নামক পদার্থটি হঠাৎ তাহার ভিতর হইতে কর্পূরের মত উবিয়া গিয়াছিল হতভাগ্য ফটিক ঠাকুর তাহা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে নাই; তাহার উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশপুরুষ কস্মিনকালে তাম্রকূটরূপ মহাদ্রব্য স্পর্শ না করিলেও তাহাকে হুঁকাপ্রদানের নিষেধাজ্ঞা প্রচার হইয়া গেল।

পল্লবিত হইয়া কথাটি ফুলির কানে পৌছিতেও বেশী সময় লাগিল না। ঘৃণায় অপমানে তাহার পায়ের ডগা হইতে মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত হইতে লাগিল।

বদ্ধ ঘরের বাতাস তাহার কাছে অসহনীয় হইয়া উঠিল। এমন সময়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে সঙ্কুচিতভাবে সে ফটিক ঠাকুরের দাওয়ায় আসিয়া উঠিল। ফটিক ঠাকুর নির্ব্বিকার চিত্তে প্রদীপটি জ্বালাইয়া তখনও অতি নিবিষ্টমনে কি একখানা পুথি পাঠ করিতেছিল। ফুলি দরজার

ফাঁক দিয়া সেই অস্পষ্ট আলো-ছায়ায় চাহিয়া দেখিল সে মুখে লজ্জার অতি ক্ষীণ ছায়াও প্রতিফলিত হয় নাই। গভীর ভক্তিভরে তাহার দুইটি হাত জোড় হইয়া আসিল। তাহার হৃদয়ের সকল ক্ষুব্ধ চঞ্চলতাকে এই বিরাট মহিমাময় চরিত্রের সম্মুখে শান্ত করিয়া লইয়া একবার মাথা অবনত করিল।

আজ ইহাতেও যেন তাহার তৃপ্তি হইল না। ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া ঠাকুরের দুইখানি পায়ের নীচে বিপুল কেশভারসহ মস্তকখানি লুণ্ঠিত করিয়া দিল। ঠাকুর চমকিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি তাহার মাথার উপর দুইখানি স্নেহহস্ত রক্ষা করিয়া হাসিয়া কহিল "একিরে ?" ফুলির চোখে জল ছলছল করিল। ফুলি কহিল "দাদা, শুধু আমার জন্যেই যখন তোমার ওপর এই অত্যাচার,আমি তা কিছুতেই সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না। তুমি আর আমার দিকে ফিরে চেয়ো না। যিনি সকলকে দেখেন তিনি নিশ্চয়ই আমায়ও ফেলতে পারিবেন না।" মুহূর্ত্তে ফটিক ঠাকুরের হাস্যময় মুখ গম্ভীর হইল। কহিল "না ফুল, এই একটা বিষয়ে আমি ভগবানের উপর ভার দিয়েও নিশ্চিন্ত হতে পার্‌ব না।" ফুলি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। ফটিক ঠাকুর আবার তেমনি সহজ কণ্ঠে কহিল "ওরে ফুল, মিছামিছি ভাবিস্ না; যা শুধু কাল্পনিক, তাকে নিজের মনে বাস্তব করে তুলে, যে দুঃখ রচনা করে, বল দেখিনি তার জন্যে দায়ী সে নিজেই কি না।"

তখন একটা দুইটা করিয়া নিবিড় আকাশে তারার ফুল ফুটিতেছিল। ঠাকুর খোলা জানালা দিয়া আকাশের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া কহিল "চেয়ে দেখ দেখি বোন্ ঐ যে অযুত চক্ষুর প্রশান্ত দৃষ্টি আমাদের উপর আশীর্ব্বাদের মতন বর্ষিত হচ্ছে, সেই দৃষ্টির সম্মুখে আমরা মুক্ত এই

আশ্বাসই কি আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়!" ফুলি আর একবার সেই অগাধবিশ্বাসভরা নির্ম্মল মুখখানির দিকে চাহিয়া সম্ভ্রমে মস্তক অবনত করিল।

কিন্তু হইলে কি হয়, নারী চিরদিনই নারী! অভিমানিনী বালিকা তাহার নারীত্বের অবমাননা নির্ব্বিকারভাবে সমানে সহ্য করিয়া আসিতে পারিল না।

গ্রামে হৈচৈ পড়িয়া গেল, সেদিন খামাখা কামার-ছুঁড়িটা গলায় দড়ি দিল, আজ আবার মোছলমান-ছুঁড়িটা এই কাণ্ড বাধাইল। নানা আলোচনার পর বিজ্ঞ ব্যক্তিরা ইহা বুঝিল যে ছলাকলাময়ী নারীর এই মরণ ব্যাপারটার মধ্যেও একটা ভান রহিয়া গিয়াছে!

(৬)

গভীর নিশিথে অরণ্যানীর প্রান্তভাগে একটি লোক ধীরে ধীরে ভূমি খনন করিতেছিল। শবাধারে একটি নারীর মৃতদেহ শয়ান। স্ফুট চন্দ্রালোকে কবর-খননকারী লোকটির স্কন্ধের যজ্ঞোপবীত তখনও ধব ধব করিয়া জ্বলিতেছিল। আর পার্শ্বে এক মাত্র সঙ্গী একজন মুসলমান মোল্লা নীরবে দণ্ডায়মান ছিল।

ভূমি খনন শেষ হইলে লোকটি শবাধারের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার উপর তাহার পলকহীন চক্ষু দুইটির দৃষ্টি স্থাপন করিল। মনে হইল সেই নিস্তব্ধ নিশীথে শূন্য প্রান্তরে আকাশভরা জ্যোৎস্নাকে যেন সেই দৃষ্টি এক মুহূর্ত্তেই নিষ্প্রভ করিয়া দিল। তাহার নিকট তখন পৃথিবী নাই, আলো নাই, বাতাস নাই। মনে হইল এক বিরাট নিস্তব্ধতা আসিয়া যেন এখনই সমস্ত বিশ্বচরাচরকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে!

মোল্লা ধীরে ধীরে যথারীতি মৃতার শেষকৃত্য সমাপন করিল। তারপর বহু আদরের বহু যত্নের ধনটিকে চিরদিনের দুর্ভেদ্য মৃত্তিকার কারাগারে নিহিত করিবার সেই নিদারুণ ক্ষণ যখন উপস্থিত হইল, তখন মোল্লার আহ্বানে তাহার চমক ভাঙ্গিল। পারিপার্শ্বিক সমস্ত অবস্থা যেন ক্ষীণ ভাবে দূর স্বপ্নাগতের মত স্মরণ রহিল। হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল তাহাকে যে এখনও আশীর্ব্বাদ করাই হয় নাই,—যেমন করিয়া একদিন এই পৃথিবীর ধূলিতে থাকিতে হাসিকান্নার মধ্য দিয়া বিদায়ক্ষণে স্নেহময় দুইখানি হাত তাহার মাথার উপর রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিয়াছে; কঠিন বাস্তবতার আঘাতে আবার তাহার চমক ভাঙ্গিল, এখন যে আর তাহাকে ছুইবার অধিকার তাহার নাই—পৃথিবীর সব মায়া, সব বন্ধন কাটিয়া দিয়া এখন যে তাহাদিগের মধ্যে দুশ্ছেদ্য অনন্ত ব্যবধান! শুধু তাহার সেই অসহায় বিষাদ-করুণ দুইটি চক্ষুর অর্থভরা দৃষ্টি ফুলের কবরের উপর নিবদ্ধ রহিল।

হে নির্ম্মল, হে শুচিস্মিতা, তুমি ক্ষুব্ধ হইও না। অন্তরীক্ষের পরপার হইতে আজিও তেমনি তোমার প্রসন্ন দক্ষিণ করখানি বাড়াইয়া দাও এবং তাহাগ্রহণ কর যাহা অমৃত—চির অনাহত।

ছুগাজানি গ্রামের বনের পাখীরা প্রভাতী গাহিল, গৃহস্থেরা ঈশ্বরের নাম করিয়া গাত্রোত্থান করিল। কেবল উঠিল না ফটিক ঠাকুর। সংসার-পথের পরিশ্রান্ত ভ্রান্ত পথিকের বুঝি এতদিনে পারের খেয়ার সন্ধান মিলিয়াছে।

নূতন উষার জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে ফটিক ঠাকুরের দুয়ারে তেমনি ঘা

পড়িল, দুঃখী ও দুঃস্থ সংসার আজিও তেমনি পিছন হইতে মাথা কুটিতেছে,
—ঠাকুর! ঠাকুর!

কেবল তারাচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় চৌধুরীবাবুদের পাশার আড্ডা হইতে ফিরিবার সময় সংবাদটি পাইয়া এবং পূর্ব্ববর্ত্তী কোন একটি বিশেষ ঘটনার সহিত মিলাইয়া উৎসাহিত হইয়া কহিলেন, "নারায়ণ তার বিচার করছেন, —নচ্ছার, বখাটে, হতচ্ছাড়া।—"

———

ভুল

"ডাক্তার বাবু, আমার বুকটা দেখুন দেখি,—"

নগরীর খ্যাতনামা বিলাত ফেরত ডাক্তার। অনেকগুলি রোগী চারিদিক ঘিরিয়া চেয়ার, টুল ও বেঞ্চে বসিয়া আছে। কেউ জ্বরো রোগী, ম্যালেরিয়ার কাঁপুনি একটু একটু আরম্ভ হইতেছে, কাহারও উদরাময়, কাহারও অজীর্ণ, কাহারও হাঁপানি, কাহারও বা সর্দ্দি কাসি। ডাক্তার বাবু নাড়ি টিপিয়া, জিভ্ দেখিয়া, বুকে চোঙ্ লাগাইয়া একে একে রোগীদিগকে পরীক্ষা করিয়া যথাযথ ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিতেছেন।

এইরূপে সমস্ত রোগী যখন দেখা প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় একজন যুবক ডাক্তার বাবুকে উদ্দেশ করিয়া তাহার বুক পরীক্ষার জন্য আহ্বান করিল। যুবকের দেহে রোগ জনিত কোনওরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষিত না হইলেও তাহার মুখখানি কি এক দারুণ হতাশায় যেন পরিম্লান।

ডাক্তার বাবু যথারীতি পরীক্ষা করিয়া কৌতূহল জড়িত-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি বুক পরীক্ষার জন্য এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, বলুন দেখি ?

রোগীর মুখ কি এক উত্তেজনায় বিবর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু চোখ জলন্ত আঙ্গারখণ্ডের মত জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

"আমার বিশ্বাস—যাক্ পরীক্ষাটা আপনি শেষ করেই ফেলুন আগে। হাঁ, টিউবার কিউলিসিস্ নাকি বলেন আপনারা,—সোজা বাংলায় যাকে ক্ষয়রোগ অর্থাৎ যক্ষ্মা বলে—"

"অ্যা বলেন কি ?"---বলিয়া ডাক্তার পুনরায় চোঙ্গ লইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তারপর রোগের উপসর্গ সম্বন্ধে প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। ডাক্তারের মুখ ক্রমে প্রসন্ন হইয়া উঠিল। যন্ত্রটী পকেটে পুরিয়া রোগীর পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন,—"আমি যদি এখন আপনাকে বলি যে,"—ডাক্তার তাহার বক্তব্য শেষ করিবার পূর্ব্বেই রোগী এমন করিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইল যে হঠাৎ তিনি তাহার কথার মাঝখানে থামিয়া গেলেন। রোগীর মুখ কি এক আতঙ্কে, বিস্ময়ে, উত্তেজনায় মৃতের মত বিবর্ণ দেখাইতে লাগিল। শুধু চক্ষুকোটর হইতে চক্ষু দুইটী যেন দীপ্ত জ্বালায় আরও দ্বিগুণ জ্বলিতে লাগিল। ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, —"ভয় নেই, আমি এমন কিছু বলতে বাচ্ছি না যা,—অবশ্য যদিও হঠাৎ ক্ষয়রোগ বলেই সন্দেহ হয় কিন্তু—"

"তা নয় এইত ?—উঃ" বলিয়া গভীর হতাশে রোগী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

ডাক্তার বিমূঢ়ের মত রোগীরদিকে চাহিয়া রহিলেন। কিঞ্চিৎ বিরক্তও যে না হইলেন এমন নয়। তবে হয়ত অসহ্য আনন্দের উত্তেজনায়—রোগীর মানসিক বিকার উপস্থিত হইয়া থাকিবে, অথবা—ডাক্তার বলিলেন —"আপনার অবস্থা অতি সঙ্কটাপন্ন এই সংবাদ শুনবার জন্যই কি আপনি আগ্রহান্বিত ছিলেন ?" রোগীর সে কথা কাণেও পৌঁছিল কিনা সন্দেহ। বলির পশু সদ্য মুণ্ডহীন অবস্থায় যেমন হাত পা ছুড়ে লোকটীর দেহ তেমনি ছট্‌ফট করিয়া এলাইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল।

মূর্চ্ছাভঙ্গে রোগী কিঞ্চিৎ আত্মদমন করিয়া ধীরে ধীরে আরম্ভ করিল।—"দুই বৎসর আগে আমি আপনার চিকিৎসাধীনে ছিলাম

হয়ত আপনার সেকথা মনে নাই। না থাকাই সম্ভব। প্রথমে সামান্য সামান্য জ্বর হয়, সঙ্গে সঙ্গে কাসির উপসর্গ আরম্ভ হয়। আপনি ক্ষয়-রোগ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। বিশেষজ্ঞের অভিমত মানিয়া লওয়া ছাড়া আর কি উপায় আছে? তাহা ছাড়া আমি নিজেও নিরক্ষর নহি যে দৈবের হাতে নিজের ভাগ্যকে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিব। আমার মনের অবস্থা তখন কিরূপ হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। মৃত্যুকে ধ্রুব নিশ্চয় জানিয়াই এবং সেই মৃত্যুভয়েই যে আমি কেবল আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম তাহা নহে। আমি ধনী সন্তান। পত্নী নির্ব্বাচনে পিতৃদ্রোহ করিয়া প্রথম যৌবনের উন্মেষে দারিদ্র্য বরণ করিয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু দাম্পত্য-জীবনে সেজন্য একদিনও আমার অনুতাপ করিবার অবসর ঘটে নাই। দারুণ জীবন সংগ্রামে প্রতিদিনের আহার আমাকে বহু আয়াসে উপার্জ্জন করিতে হইত। সমস্ত দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর যখন শ্রান্ত মন, অবসাদগ্রস্ত শিথিল দেহভার কোনমতে বহন করিয়া গৃহে ফিরিতাম, আমার ক্ষুদ্র সংসারের স্নেহের বন্ধন আমায় নূতন বলে নূতন আনন্দে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিত। সারা দিবসের কর্ম্ম-ক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত দেহ মন লইয়া যখন বাড়ী ফিরিতাম, গবাক্ষপথে দুইটী প্রতীক্ষমান আঁখি-তারকা, আমার নিবিড় অন্ধকারময় জীবন-পথে ধ্রুব-তারার মত পথ দেখাইত। প্রতিদিনের মিলন বিরহ, মান অভিমান, লইয়া চিরন্তন নায়ক-নায়িকার মত, নদীর স্রোতের মত জীবনের দিনগুলি কেমন করিয়া অবাধগতিতে বহিয়া যাইতেছিল একদিনও তাহার সন্ধান লই নাই। বিশ্বনিয়ন্তার আমোঘ বিধানে একদিন যে এই জীবন-ধারার সরল অবাধ গতি বক্রধারায় পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, একথা তখন একবার

ভুলেও ভাবিয়া দেখি নাই। যাক্, যে সব কথা এখন সবিস্তারে বলিয়াই বা কি হইবে? এক কথায় বলিতে গেলে আমার সর্ব্বনাশের বীজ এই কক্ষে—এমনি সময়ে আপনি স্বহস্তে একদিন এই হৃদয় ক্ষেত্রে রোপণ করিয়াছিলেন, বিস্মিত হচ্ছেন? না বিস্ময়ের কোনই হেতু নাই। দুই বৎসর পূর্ব্বে, হাঁ ঠিক দুই বৎসরই হবে—আপনি আমার ক্ষয়রোগের কথা অর্থাৎ বিজ্ঞানশাস্ত্র সঙ্গত ধ্রুব মৃত্যুর পরোয়ানার কথা এমনি সময় এমনি ভাবে এই কক্ষে বসে বিজ্ঞের মত উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

কুক্ষণে আপনার মত বিজ্ঞ বহুদর্শী বিশেষজ্ঞের অভিমতের জন্য আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, সেই অভিশপ্ত মুহূর্ত্তের কথা আজও যেন স্মৃতি-পথে জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে।

গৃহে ফিরিয়া সেই দিনই শয্যাগ্রহণ করিলাম। সারারাত্রি নিদ্রা হইল না। চিন্তা করিতে লাগিলাম। ঘোরা তমোময়ী কাল রজনী, সম্মুখে সীমাহীন—অন্তহীন—পারাপারশূন্য—দুস্তর অর্ণব। কোন কূল কিনারা পাইলাম না। নিতান্তই অসহায় অসমর্থ উপায়হীন! ভাবিলাম মানুষের ভাগ্য কি নির্ম্মম ভাবেই না তাহাকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চালিত করে। সুনিশ্চিত পরিণাম সম্বন্ধে আশার ক্ষীণ রশ্মিটুকুও দেখিতে পাইলাম না। সমস্ত সুদীর্ঘ রজনীব্যাপি বাঁচিবার জন্য সে কি আগ্রহ! মৃত্যুকে সম্মুখে রাখিয়া জীবন যে কত লোভনীয় কত মোহনীয় তাহা সেই কাল নিশীথে কণ্টকিত শয্যায় অতন্দ্রিত অবস্থায় প্রথম অনুভব করিতে লাগিলাম। অপূর্ণ অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া এই তরুণ জীবনের মোহময় উষায় বিদায়ের পালা শেষ করিয়া যাইতে হইবে। হৃদয় মথিয়া প্রশ্ন উত্থিত হইতে লাগিল—লোকচক্ষুর অতীত, অদৃষ্ট,

অজ্ঞাত, অতীন্দ্রিয় এমন কি কোন শক্তিই নাই যাহা এই তরুণ জীবনকে মরণের করাল গ্রাস হইতে টানিয়া ছিনাইয়া লইতে পারে?

সমস্তরাত্রি এমনি করিয়া মরণের বেলায় দাঁড়াইয়া জীবনের মাধুরী উপভোগ করিতে লাগিলাম। পার্শ্বে নিদ্রিতা পত্নী। মেঘাবৃতা শশীর ন্যায় সে মুখ উৎকণ্ঠা-মলিন। একবিন্দু অশ্রু যেন তখনও আঁখির পাতায় লাগিয়া রহিয়াছে। নিদ্রাঘোরে স্বপ্নাবেশে যেন মুখখানা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। গবাক্ষ বাহিয়া ফুল্ল জ্যোৎস্নাধারা সে মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল। আমি স্পন্দহীন বক্ষে, নিমেষহীন চক্ষে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। কিছু ভাবিবার, কিছু করিবার, কোন কিছুর আশা আকাঙ্ক্ষা বা কামনার সমস্ত শক্তি যেন আমা হইতে চলিয়া গিয়াছিল। আমি যেন তখনই—সেই মূহূর্ত্ত হইতেই অতীতের মানুষ হইয়া গিয়াছিলাম। যেন চক্ষের পুরোভাগে ঘুমন্ত সৌন্দর্য্যরাশি, যাহা একদিন আমার ছিল, যাহা একদিন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছিল, যেন তাহা অলক্ষ্যে কখন আমার স্পর্শবোধের অতীত হইয়া গিয়াছে। যুগ যুগান্তর হইতে, দূর—বহুদূর হইতে যেন আমি নির্ণিমেষ আঁখিতে শুধুই দ্রষ্টার মত, নির্লিপ্ত উদাসীন কবির মত, বিস্ময়ে কৌতুহলে চাহিয়া আছি। সুদূর অতীতের হাসি ও অশ্রু, মিলন ও বিরহ, পাশাপাশি হাত ধরাধরি করিয়া আবেগ কম্পিতপদে যেন আমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল।

কল্পনায় বাধা পাইলাম। জড়ত্ব কাটিয়া গেল। ছোট মেয়েটার কয়দিন হইতেই অল্প অল্প জ্বর ছিল, সঙ্গে কাসিও ছিল। দূরদৃষ্টবশতঃ আমার উত্তপ্ত মস্তিষ্ককে আরও উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া সে সেই মূহূর্ত্তেই পুনঃ পুনঃ কাসিতে ও হাঁফাইতে লাগিল। আমি উঠিয়া গিয়া তাহার গায়ে

হাত দিলাম, জ্বর তখনও বেশ ছিল। আমার হৃদয়ে সহসা কি এক দারুণ চিন্তা যেন শানিত ছুরিকার ন্যায় বসিয়া গেল। মনে হইল এই দুরারোগ্য ব্যাধির জন্য আমিই দায়ী। এই কুসুমপেলব সুকুমার দেহের তীব্র রোগবীজাণু স্নেহময় পিতা হইয়াও আমিই ছড়াইয়া দিয়াছি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘুমন্ত শিশুগুলি তখনও নিঝুম ঘুমাইয়া আছে। তাহাদের অর্দ্ধস্ফুট কুসুমকোরক মুখের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। তাহাদের অশেষ দুঃখ যন্ত্রণাময় ভবিষ্যৎ যেন আমার চোখের সম্মুখে প্রস্ফুট হইয়া উঠিল। রাশি রাশি পাপের ভার আমার মাথায় উপর স্তূপীকৃত হইয়া উঠিল। চারিদিক হইতে কি এক দূষিত বাষ্পে যেন বাতাস ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছিল। রুদ্ধদ্বার গৃহে যেন আমার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। সম্বিৎহীন অবস্থায় দেহযষ্টি গৃহতলে লুটাইয়া পড়িল।

রাত্রি প্রভাত হইল। প্রভাতে পাখীরা গাহিয়া উঠিল। নবীন ঊষা রক্তিম রাগে দিকে দিকে নবীন আশার বাণী প্রচার করিল। কিন্তু এই মুমূর্ষু আশাহত প্রাণে তাহার কোন সাড়াই বাজিয়া উঠিল না। সমস্ত হৃদয় ভেদিয়া আর্ত্তনাদ জাগিয়া উঠিল—বৃথা! বৃথা! বৃথা!

কেমন করিয়াই বা ইহার অন্যথা হইবে? আপনারা বিশেষজ্ঞগণই যে দয়া করিয়া কত আয়াস স্বীকার করিয়া সর্ব্বসাধারণের সাবধানের জন্য খবরের কাগজে ও নানা পুঁথির পাতায় পাতায় অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণ সহকারে রোগের বীজাণুতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন। ইহার পরেও অজ্ঞ মানব সাধারণের সন্দেহের, অবিশ্বাসের, আশার অবসর কোথায়?

পরদিন প্রাতে যখন শয্যা ত্যাগ করিলাম তখন আমি কায়ে ও মনে স্থবির, বিকলাঙ্গ, পলিতকেশ বৃদ্ধ। পত্নীর প্রেম, উৎকণ্ঠভরা ছল ছল আঁখি, স্নেহপুত্তলিগণের আধ আধ কলভাষ, আমার কাছে বহু দূরবর্ত্তী অতীত স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

রোগী হঠাৎ কথার মাঝখানে থামিয়া, প্রেতমূর্ত্তি দেখিয়া লোকে যেমন ভীত, ও স্তম্ভিত, বিমূঢ় হইয়া পড়ে তেমনি অর্থহীন, শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।—মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জানিয়া বহুকষ্টে রোগযন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি দিবার জন্য আমি স্বহস্তে তাহার ব্যবস্থা করিলাম। চম্‌কাচ্ছেন? হত্যা—হাঁ হত্যা বৈ কি! রোগে চিকিৎসা পায় নাই, ক্ষুধায় আহার্য্য পায় নাই. শীতের বস্ত্র পায় নাই। বহুদিন ধরিয়া তিলে তিলে মরার চেয়ে যত শীঘ্র সে ভঙ্গুর জীবনের অবসান হয় তাহাই কাম্য নয় কি? পাশ্চাত্য কুহকময়ী বিজ্ঞান, শিক্ষার অভিমান, বিশেষজ্ঞের অভিমত এই একই পথ নির্দ্দেশ করিয়াছিল। একে একে তাহারা অনাদরে আশঙ্কায় বিরাট ঔদাসীন্যের সমক্ষে নিজ নিজ দেহ বলি সাজাইয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহাই তাহাদের মঙ্গলময় পরিণাম জানিয়া এতদিন নিশ্চিন্ত অনুদ্বিগ্নভাবে কাল কাটাইয়াছি। আর আজ? কিন্তু—.

বলিতে বলিতে সহসা দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া অতর্কিতভাবে বিদ্যুদ্বেগে রোগী উঠিয়া দুই বজ্রমুষ্টিতে ডাক্তারের কণ্ঠনালী চাপিয়া ধরিল। তাহার চক্ষু দুইটী বুভুক্ষিত হিংস্র শ্বাপদের দৃষ্টির জ্বালাময়ী দীপ্তিতে আগুনের পিণ্ডের মত জ্বলিতে লাগিল।

গোঙানি শব্দে আকৃষ্ট হইয়া বহুলোক ছুটিয়া আসিল। এবং রোগীকে ঘিরিয়া ক্রুদ্ধভাবে সকলেই প্রহার করিতে লাগিল।

কিন্তু চৈতন্যসম্পাদিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার চক্ষু মেলিয়া প্রহারোদ্যত, ক্রোধোন্মত্ত সকলকে নিরস্ত হইবার ঈঙ্গিত করিয়া কহিল, "যেতে দাও, পাগল।"

এদিকে রোগীর রুগ্ন অবসন্ন দেহ এতগুলি লোকের প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল।

ডাক্তার অবসাদগ্রস্তভাবে চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া দুইহাতে চোখ মুখ ঢাকিয়া অস্ফুট হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—"উঃ কি মারাত্মক ভুল,—ভুল, ভুল—"

শেষ শিক্ষা।

গঙ্গা-জলাঙ্গী-সঙ্গমে বাঙ্গলার মহাতীর্থ নবদ্বীপধাম আজিও মহাপ্রভুর চরণরেণু বক্ষে ধারণ করিয়া পুণ্যভূমি রূপে মোহাবিষ্ট পতিত সংসারদাবদগ্ধ সহস্র জীবকে আশ্রয় দান করিতেছে।

এই মহাতীর্থের এক নির্জ্জন প্রান্তে একটি কক্ষে রোগশয্যায় শায়িতা অনতিক্রান্তা-যৌবনা অপূর্ব্ব রূপময়ী রমণী ;—সায়াহ্নে পথহারা মেঘের মত তাহার মুখ খানি গুরুগম্ভীর, ভাবলেশহীন।

অর্দ্ধবয়সী জনৈকা বৈষ্ণবী, খঞ্জনী বাজাইয়া গান গাহিয়া ভিক্ষা লইয়া চলিয়া গেল। গানের সেই করুণ আত্মনিবেদন রমণীর মর্ম্মে বিঁধিল। রমণীর চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। কুণ্ঠাজড়িত কণ্ঠে বালক শুধাইল, "মা, তুমি কাঁদছ ?"

জননী চক্ষু মুছিলেন। মুখে কিছু না বলিয়া কিশোর পুত্রকে বক্ষে টানিয়া লইয়া সস্নেহে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

মায়ের নীরব স্নেহের পরশ ছেলের উদ্বেলিত জিজ্ঞাসু মনকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। ছেলে আবার আগ্রহ-মাখান কোমল কণ্ঠে ধীরে ধীরে কহিল, "কতদিন আমি দেখেছি তুমি একা একা আমাদের লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদ।"

জননী তেমনি নীরব রহিলেন। এই কাচা ছেলেটীর কাছে যেন আজ ধরা পড়িয়া গেলেন। কিন্তু তাহার জীবনে যে কত দুঃখ, কত সন্তাপ,

কত গ্লানি, তাহা এই ক্ষুদ্র বালকের কাছে বলিয়া লাভ কি, আর বলিবার আছেই বা কি ? অথচ দুঃখ নাই, চোখের জল নিছক মিথ্যা, প্রতিদিনের প্রতি মূহূর্ত্তের সঞ্চিত সীমাহীন অশ্রুবন্যার পশ্চাতে কোনই অর্থ নাই, আজ এই ক্ষুদ্র শিশুটীর কাছেও এই বঞ্চনা করিতে তাহার মন সরিল না।

জননী কোমলকণ্ঠে কহিলেন, "সেই কথা তোদের ঠিক বুঝাতে পারি না বলেই ত আমার মরণেও শান্তি নাই।"

জননী তেমনি সস্নেহে বালকটীর মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। আঁধার পথের যাত্রী যেমন করিয়া আলোর সন্ধানে উন্মুখ হইয়া থাকে, তেমনি রমণী তাহার দুই প্রতীক্ষমান চক্ষু জানালা বাহিয়া বাহিরের নীল আকাশ, নীলিমাবৃত দূর দিগন্তের উপর সংস্থাপিত করিল। বক্ষপঞ্জর ভেদ করিয়া তপ্ত দীর্ঘশ্বাস,রুদ্ধদ্বার রুদ্ধকক্ষের বাতাসে মিলাইয়া গেল।

ছেলে,জননীর ম্লান ছায়াচ্ছন্ন মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বুকের ব্যথাটা কি আজ বাড়্‌ল মা ? চুপ্‌ করে একটু ঘুমাও আমি ততক্ষণ বুকে বালিশটা দিয়ে দিচ্ছি।" জননীর মুখখানি ছাপাইয়া অপূর্ব্ব হাসি ফুটিয়া উঠিল—যেন ঘনঘটাচ্ছন্ন সায়াহ্নের আকাশ চিরিয়া অপূর্ব্ব বিদ্যুচ্ছটা !

"বুকের ব্যথা ! হাঁ বুকের ব্যথাই বটে। কিন্তু এ ব্যথা ত বালিসে সারবার নয়। তার চেয়ে তুমি আরও একটু কাছে এসে বোস আমি ততক্ষণ তোমার মুখখানি একবার ভাল করে দেখি ! অজিত ঘুমিয়েছেরে ?

"না, সে ত ঐ বাইরে উঠানে খেল্‌ছে।"

"হাঁ ঐ তার হাসি, আমি এইখান থেকেই বেশ শুন্‌তে পাচ্ছি।

আঃ! তোদের মুখের এই হাসিই সম্বল নিয়ে যদি চিরদিনের মত বিদায় নিতে পারিতাম!"

অব্যক্ত, সীমাহীন বেদনায় রমণীর চক্ষু সজল ও কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল।

"অজিতকে ডাক্‌বো মা?"

"না থাক্। হাঁ সুকু, তোদের পরীক্ষার ফল আজও বেরোয় নি রে?"

"হাঁ মা' কাল বেরিয়েছে। তোমার অসুখ বেড়েছে বলে কাল বল্‌তে পারিনি। এবারেও আমিই প্রথম হয়েছি। গুরু মহাশয় বল্লেন, আর এক বছরেই আমার পাঠশালায় পড়া শেষ হয়ে যাবে।"

জননীর নিষ্প্রভ চক্ষুতারকা আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে আনন্দচ্ছটা,—আতুর কণ্ঠ, ক্ষীণ ভাষা, প্রকাশে অক্ষম। জননী ধীরে সস্নেহে পুত্রকে বক্ষে টানিয়া লইলেন। তাহার পলকহীন দুই চক্ষু সহস্র ধারায় আশীষ ধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। সেই অসহ্য তীব্র আনন্দের নীরব অনুভূতির মাঝে বক্ষের ঘনস্পন্দনও যেন ক্রমে স্তিমিত হইয়া আসিতে লাগিল।

"হাঁ, আমি জানি একদিন তোমরা মানুষ হবেই। আমার এত দুঃখ, এত সাধনা, নিস্ফল যাবে না। কিন্তু দুঃখ এই যে, আমি তা চোখে দেখে যেতে পার্‌লেম না।"—বলিতে বলিতে অশেষ ক্লান্তিভরে রমণী হাঁফাইতে লাগিলেন।

"তোমার কি বড় কষ্ট হচ্ছে মা? ডাক্তার বাবু যে বলে গেলেন একটু বিশ্রাম নিলেই সেরে যাবে।"

"বিশ্রাম ? হা বিশ্রামইত চাই। কিন্তু ডাক্তার যে বিশ্রামের কথা বলেছেন সে বিশ্রাম নয়। আর রোগ ? সে রোগের কথা ডাক্তার কি বলবে ? এ রোগের কথা ত তাঁর পুঁথিতে লেখা নেই।—এ যে কেমন করে দিন রাত্রি এই দেহের ভিতরটা জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে, সেত চোখে দেখা যায় না, সেত নাড়ী টিপে বোঝা যায় না। ডাক্তারের অপরাধ কি ?" রমণী আবার অবসাদভরে এলাইয়া পড়িল।

"মা, মা" বলিয়া আর্ত্তকণ্ঠে ছেলে কাঁদিয়া উঠিল। দুইহাতে মাকে জড়াইয়া ধরিল কিছুতেই যেন সে মাকে ছাড়িয়া দিবে না। জননীর চোখে জল, মুখে ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল।

"আঁকড়ে ধরে কি আর আমায় রাখতে পারবি, পাগল ? আর যতটুকু সময় আছে আমায় একটুক হাস্‌তে দে, সুখী হ'তে দে। তোদের হাসি মুখ দেখে যাই। কেন আর বিদায়ের বেলায় চোখের জল ফেলাবি ? যত দিন বেঁচে ছিলাম কেঁদেই ত গেলাম নীরবে, নিভৃতে, তোদের চোখ এড়িয়ে এড়িয়ে চোখের জল ত কতই ফেলেছি, আর কেন ?"

ছেলে দুই হাতে জননীর কণ্ঠ জড়াইয়া জননীর বুকে মুখ লুকাইল

"সুকু ?"

"কি মা ?"

"আমি চলে গেলে তোদের বড় কষ্ট হবে, নয় ?—কি করবি বল ? হয়তো আমার বেঁচে থাকা তোদের পক্ষে মঙ্গল নয় বলেই ভগবান আমায় সরিয়ে দিচ্ছেন, তিনি যে মঙ্গলময়, বাবা। সব সময় কি আমরা তাঁর মঙ্গল অভিপ্রায় বুঝতে পারি ?"

অভিমান-ক্ষুব্ধ বালক নিজ কণ্ঠলগ্ন জননীর হাত ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া

মুখ ফিরাইয়া লইয়া কি যেন কহিতে গেল, কিন্তু চাপা কান্নায় কথা শেষ করিতে পারিল না। কেবল দারুণ অভিমানে ক্ষুদ্র বালকের ঠোঁট দু'খানি কাঁপিতে লাগিল।

জননী অভিমানী বালককে সস্নেহে নিকটে আকর্ষণ করিলেন। স্নেহাঞ্চলে চোখের জল মুছাইয়া দিলেন, চিবুক তুলিয়া ধরিয়া মুখ চুম্বন করিলেন। হাঁ, এই মুখ এই চোখ,—এযে তাহার জাগ্রতের ধ্যান, নিদ্রার স্বপন্। এ মুখ কি ভোলা যায়? অতৃপ্ত বুভুক্ষিত দুই চক্ষু ভরিয়া—এই কিশোর-কমনীয় সুধামাখা প্রীতি-উদ্ভাসিত মুখমণ্ডল বহু-উপোষিত তৃষিতের মত পান করিতে লাগিলেন। এই মুখ, এই চোখ, এই কমনীয় তনু, এই প্রীতি লাবণিচ্ছটা ইহা হইতে চিরদিনের মত তাহাকে দূরে—দৃষ্টির অতীত হইয়া যাইতে হইবে? ইহাই কি সত্য? মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস বক্ষপঞ্জর ভাঙ্গিয়া ঠেলিয়া উঠিতে চাহিল।

রমণী স্নেহ গদ্‌গদ্ কণ্ঠে ডাকিলেন, "সুকু"।

"কি মা?"

"শোন, কাল পর্য্যন্ত হয়ত আমি বাঁচব না। আর আমরা কেউ কাউকে দেখতে পাব না। তুমি বালক হ'লেও দুদিন পরেই তোমাকে সংসারে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, মানুষ হ'তে হবে, অভিভাবক হতে হবে। তাই আজ তোমাকে কয়েকটি বিশেষ কাজের কথা বলতে যাচ্ছি। মনে রেখ এ আমাদের একান্ত ঘরের কথা। বাইরে এ নিয়ে কারো সঙ্গে কোন দিন আলোচনা না হয়। এই আমার ছোট সিন্দুকের চাবী। সিন্দুকটা খোল। একটা কাগজের মোড়কে কতকগুলি চিঠি গুছান আছে। হাঁ, এই গুলিই। ঐ সিন্দুকেই রেখে দাও। আমার যখন

শেষ হয়ে যাবে, সেই চিতার আগুণে এগুলো দিও। এর কোন চিহ্ন কোন অবশেষ আর না থাকে। ওতে কি আছে, তা জানতে চেয়ো না, দেখতে ও চেষ্টা ক'রো না। তুমি এখনও ছোট। হাঁ মনে রেখো, পৃথিবীতে অনেক জিনিষ আছে যা জানার চেয়ে না জানাই ভাল।"

"সুকু?"

"কি মা?"

"কালী কলম আছে? হাঁ, আর এক টুকরা কাগজ নিয়ে এসো। বেশ। লেখো"—নিজ মনে অর্দ্ধ স্বগতভাবে অস্ফুট কণ্ঠে কহিলেন—"লিখবার আছেই বা কি। "হাঁ কি বলছিলাম? লেখো "মা মরবার সময় আপনাকে প্রণাম করে গেছেন।" নীচে তোমার নাম স্বাক্ষর কর। ঠিকানা? রমণীর কণ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল, "হাঁ লেখ, শ্রীযুক্ত প্রতাপাদিত্য রায় প্রবল প্রতাপেষু, জমিদার, পোঃ দীঘিরপার, ময়মনসিংহ।"

একটু থামিয়া হাঁপাইয়া কহিলেন, "আমার মরবার পর, চিঠিখানা ডাকে ফেলো।"

বালকের মুখে কৌতুহল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য। জননীর পাংশু-বিবর্ণ মুখ এবং করুণ সজল চোখের দিকে চাহিতেই তাহার প্রশ্ন হৃদয়তলেই নীরবে বিলীন হইয়া গেল।

জননী ভগ্নকণ্ঠে কহিলেন, "ইনি তোমার বাবার ছেলেবেলাকার বন্ধু ছিলেন। তোমার বাবার যে গ্রামে বাস ছিল ইনি সেই গ্রামের জমিদার। হয়ত তোমাদের সেই বাস্তুভিটা এখনও তেমনি পড়েই রয়েছে। কিসের জন্য তোমার পিতাকে সাত পুরুষের বাস্তুভিটা ছাড়তে হয়েছিল, সে কথাটা

আমার মুখ থেকে তোমার না শোনাই ভাল।" জননীর দুই চক্ষু ছাপাইয়া জমাট অশ্রুর বন্যা ডাকিল।

রমণী কোন মতে দেহের অবশিষ্ট বল সংগ্রহ করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "সিন্দুকের এক কোণে একটা থলিয়াতে শ'পাঁচেক টাকা আছে। উহাই তোমার বাবার সারাজীবনব্যাপী পরিশ্রমের ফল। উহা কত দিনে কেমন করিয়া জীবনের কতখানি রক্ত জল করিয়া যে তিনি উপায় করেছিলেন তা এখন ও তুমি বুঝতে পারবে না। অতি বড় দুঃখের দিনেও ওর এক কপর্দ্দক খরচ করি নি। হয়ত আমার সে অধিকারও ছিল না। আজ ঐ টাকার থলি তাঁর বংশধরদের হাতে তুলে দিতে পেরে এক মহা সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারচি।"

"সুকু, মাণিক আমার, সারা জীবন বড় দুঃখু পেয়ে, বড় জ্বালায় জ্বলে গেলাম। দুঃখু আরও এই যে, সে কথা বলতে পারলেম না, জানাতে পারলেম না, ক্ষমা চাইবার অবসর পেলাম না। দুঃখের জ্বালায় ক্ষিপ্ত হয়ে মাঝে মাঝে নিজ হাতে এই জীবনের ক্ষুদ্র গ্রন্থিটুকু ছিন্ন করে দিতে চেয়েছি, কিন্তু কেবল তোদের মুখ চেয়েই পারি নি। আজ সেই তোদের ছেড়ে যেতে হচ্ছে।" বলিতে বলিতে শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তারপর দুহাতে তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন, "বাবা, যখন আমি চলে যাবো বল্ অন্ততঃ তুই আমায় কোন দিন ঘৃণা করবি না?"

বালক এ কথার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিল না। শুধু তাহার মাতার কাতর কণ্ঠ যেন হৃদয়ের কোন্ মর্ম্মস্থলে বার বার করুণ আবেদন জানাইতে লাগিল। বালক কিছুই চিন্তা করিতে পারিল না, কিছুই ভাবিতে পারিল না, কিছুই যেন ঠিকমত বুঝিতে পারিল না। তবুও সে অন্তরের অন্তরতম

প্রাণে অনুভব করিল যে, মানুষের বুকে বসিয়া যিনি সঙ্কট মুহূর্ত্তে কথা কহেন তিনি যেন স্পষ্ট সতেজ কণ্ঠে বালকের মুখ দিয়া অপূর্ব্ব স্বরে, অপূর্ব্ব ভঙ্গিমায় কহিলেন, "মা, মা, তোমায় ঘৃণা করব একি বলছ মা।"

"আঃ বাঁচলুম্। সুকু, বিদায়ের বেলা তোমাদের দু'ভাইয়ের সকল বালাই নিয়ে আমি যাচ্ছি, আর আশীর্ব্বাদ করে যাচ্ছি, তোমরা মানুষ হও, সংসারে তোমাদের পিতার নামে পরিচিত হও।"

এক অমানুষিক উত্তেজনার আবেগে রমণীর সমস্ত দেহ কম্পিত হইতে লাগিল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল।

"সুকু, তোমাদের যিনি পিতা ছিলেন, জীবনে তিনি যেমন অসাধারণ ছিলেন মরণেও তেমনি মহিমাময় রূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন। তিনি আর্ত্তনাদ করে মরেন নি,—প্রাণ দিয়েছেন। দারিদ্র্য তাঁহাকে টলাতে পারে নি, ভয়ে তাঁর মাথা নত হয় নি, অনশন তাঁকে ক্লিষ্ট করতে পারে নি। সেই মানুষকে আমি"-- বেদনায় পুঞ্জীভূত জমাট অশ্রুরাশি যেন বক্ষতলে আছড়াইয়া মাথা কুটিতে লাগিল।

রমণী-কণ্ঠের জড়ত্ব ঠেলিয়া ফেলিয়া স্পষ্টকণ্ঠে ডাকিলেন, "সুকু" ?

"কি মা ?"

"তোমার বাবার কথা মনে থাক্‌বে ? হাঁ তাঁর কথা মনে রেখো। যখন দুঃখ আস্‌বে ; রোগ শোক লোভ সম্মুখে এসে পথ রুদ্ধ করে দাঁড়াবে তখন তাঁর স্মরণ নিও। যদি কোন দিন লোভ এসে পথ আগলিয়ে আত্মীয়ের বেশে সম্পদ হাতে নিয়ে দাঁড়ায়, সে দিন মনে রেখো, ধনীর দান দরিদ্রের কাছে ভিক্ষা। নিঃসহায় নিঃসম্বল, অনাথের কাছে অযাচিত করুণার মূল্য যত মহার্ঘই হউক তবুও সে ভিক্ষা। এই ভিক্ষার কাছে

তোমার দরিদ্র পিতা মাথা নত করেন নি। এতদিন ধরে আমি যে দেবতা, যে জাগ্রত বিগ্রহকে চোখের সাম্‌নে রেখে তোমাদের শিক্ষা দিয়েছি, আজ আমার ক্ষীণ দুর্ব্বল কণ্ঠে শেষ বারের মত তাঁর কথা বলে গেলাম। এই তোমাদের মায়ের শেষ কথা, শেষ শিক্ষা। তোমরা মানুষ হও, তোমরা তাঁর মত মানুষ হও। মনে থাক্‌বে ?"

"হাঁ মা।"

"বেশ এখন যাও। ঘুমোওগে।"

পুত্র ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

"সুকু ?"

"কি মা ?"

অশ্রুবন্যা রুদ্ধ করিয়া আবেগজড়িত করুণ কণ্ঠে কহিলেন, "সুকু, বাবা, শুধু জগতে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানই কি বড় কথা, শেষ কথা ? হাঁ, নিশ্চয়ই বড়—বড় বৈকি ? যে ছোট কথা স্বপ্নেও চিন্তা করেনি, যে ছোট কাজ জীবনে কোন দিন করে নি, সে ছোটর ব্যথা কেমন করে বুঝবে বল ? তোর বাবা তাই দুঃখী জেনে, পতিতা জেনে পথের ধূলিতে অবলুণ্ঠিতা জেনেও মাথা হেঁট করে পিছু ফিরে তাকায়নি। সে যে বড় ছিল। কিন্তু তোর মা যে ছোট—অতি ছোট। আর ভাগ্য বশে সেই দীন ছোট মায়ের কোলেই এসে জন্মেছিস। যেদিন দেখবি পথের ধূলির মাঝে কেউ লুটাচ্ছে, পিচ্ছল পথে চলতে গিয়ে কেউ পড়ে গেছে, সেদিন যেন তাকে ঘৃণায়, অনাদরে, অবজ্ঞায় উপেক্ষা করে চলে যাস্‌নে। সেই লুণ্ঠিতা সেই অবজ্ঞাতার মাঝে তোর এই মাকে মনে করিস্, জীবনব্যাপী এই চোখের জলের কথা মনে করিস—"অভাগিনী আর বলিতে পারিল

না। যে গোপন উৎস বহু বৎসরব্যাপী কঠিন সংযমের বন্ধনে রুদ্ধ ছিল আজ তাহা স্নেহের সাড়া পাইয়া আলোড়িত উদ্বেলিত হইয়া দুইকূল ছাপাইয়া পড়িল। বালক ছুটিয়া আসিয়া দুই হাতে মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বক্ষে লুটাইয়া পড়িয়া আবেগ কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "খুব মনে থাক্‌বে! মা, মা, মা, আমার!"

ততক্ষণ পিছনের ডাক্, পৃথিবীর মায়া, স্নেহের বন্ধন্, দুই কোমল বাহুলতার উদগ্র বেষ্টনী পশ্চাতে ফেলিয়া জননী কোন্ সীমাহীন্ অচীন্ নিরুদ্দেশের উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছিল। নিষ্ঠুর সংসার, অকরুণ সমাজ প্রতি দিনের নিয়ম পেষণে যাহা সমাধা করিতে পারে নাই শিশুর অত্যুগ্র স্নেহের সাঁড়াই তাহা অনায়াসে সম্পাদন করিল।

* * *

পর দিবস দশম বর্ষীয় কিশোর বালক তাহার রোরুদ্যমান শিশু ভাইটীকে কোলে তুলিয়া লইয়া কোচার খুঁট দিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া দিতে দিতে সান্ত্বনা দিতেছিল, "ছিঃ কাঁদে না, মা যে স্বর্গে গেছেন। দুঃখ কিরে—এই যে আমি আছি!"

ট্র্যাজেডী।

আমরা যখন সবাই আমাদের "ঊনপঞ্চাশী" ক্লাবে বসে উমেশদার নিদারুণ অর্থ-নৈতিক আলোচনার জন্য প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতে-ছিলাম, তখন বাহিরের আকাশ মেঘে মেঘে ছাইয়া বাদলের হাওয়া বহিতে লাগিল! প্রথমে টুপ্ টাপ্, পরে আকাশ ভাঙ্গিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইল। এই বর্ষণ-মঞ্জীর-মুখর সন্ধ্যায় শঙ্কিতচিত্তে উমেশদার প্রতীক্ষা করিতে করিতেও যেন বার বার করিয়া মনে হইতে লাগিল এমন দিনে উমেশদার অনুপস্থিতিতে জ্ঞানের ভাণ্ডারে যতই টানাটানি পড়ুক তাতে তেমন মারাত্মক ক্ষতি হইবে না। কিন্তু উমেশদা লোকটী ছিলেন এমন রাসভারী গম্ভীর, তার চালচলন ছিল এমনি নিয়মিত,—আর কথাবার্ত্তা এমনি ওজন করা, যে জোর করিয়া তার সম্বন্ধে এ হেন অহেতুক আশঙ্কা করা যায় না।

কিন্তু পৃথিবীতে মাঝে মাঝে অঘটনও ঘটে। উমেশদা সেদিনকার মত সত্যই গর হাজির হইলেন।

ধীরেশ গুণ গুণ করিতে করিতে একটা তাকিয়া কোলের কাছে টানিয়া লইয়া কহিল, "এমন দিনে তারে বলা যায়", সুবিনু তাকিয়ার উপর তাল ঠুকিয়া সায় দিল, "এমন ঘন-ঘোর বরিষায়"

এই সূত্রটী টানিয়া বুনিয়া আর একজন উদাস ভঙ্গীতে কহিল, "বিভব ধন মান, কিছুই চাহি না"

২য়—"শুধু বিধি মিলাইত ভাল এক কাপ চা"

৩য়—"তার সঙ্গে যদি ভুনিখিচুরি থাকে"

৪র্থ—"আপত্তিকর নয় তা !"

গুরু মহাশয়ের অসম্ভাবিতরূপে অনুপস্থিতিতে পাঠশালার অবস্থাটি যেমন দাঁড়ায়, ছেলেদের মনে বাঁধন-হারা মুক্তির আনন্দ যেমন করিয়া বাজিয়া উঠে, এই স্তিমিত সন্ধ্যায়, মেঘ মেদুর আকাশের তলে, আষাঢ়স্য কশ্চিদ্দিবসে কলিকাতা মহানগরীর বদ্ধ এক কক্ষে তেমনি ছুটীর সাড়া পড়িয়া গেল।

এমন সময় এমন আসরের মান যদি কেউ রাখিতে পারে, সে অবিন্। অবিনকে সকলে চারিদিক হইতে মৌমাছির মত বেড়িয়া ফেলিল। অবিন ছিল ডাক্তার। তবে ডাক্তারির আওতায় পড়িয়াও তাহার প্রাণের উৎস একেবারে শুকাইয়া যায় নাই তাহা তাহার কথা শুনিলেই বুঝা যাইত। অবিন লোকটা যে কেমন সরস, রসাল এবং তাজা, তাহা, তাহার কথা এবং কথা বলিবার ভঙ্গী যে না শুনিয়াছে এবং দেখিয়াছে সে ঠিক ধারণা করিতে পারিবে না। অবিনকে কিছু গম্ভীর এবং তখন পর্য্যন্ত নীরব দেখিয়া ধীরেশ কহিল, "প্রারম্ভেই আশা ভঙ্গ করে দিওনা দাদা।

"আত্মরস রক্ষা করে বলে।
ইক্ষু মরে ভিক্ষুর কবলে॥
অতএব—"

মুখখানি আরও অনাবশ্যক গম্ভীর করিয়া অবিন্ কহিল, "গল্প আমি জানি না, তবে সত্য ঘটনা একটা বলতে পারি যা—"

"Truth is stranger than fiction—কোন আপত্তি নেই,—হাল ছেড় না দাদা—"

নেশাখোরেরা মৌতাতের সন্ধান পাইলে যেমন করিয়া ভিড় করিয়া ঘেসিয়া আসিয়া বসে তেমনি করিয়া চারিদিক হইতে অবিনকে ঘিরিয়া ধরিল।

অধিক গৌরচন্দ্রিকা দ্বারা মুখ বন্ধ না করিয়া অবিন সোজা সুজি ভাবে আরম্ভ করিল, "আমরা যখন মেডিকেল কলেজে পড়ি, সুরেশ ও রমেশ নামে দু'টী ছেলে আমাদের সঙ্গে পড়্‌তো। তার মধ্যে সার্জ্জন সুরেশ প্রসাদের নাম তোমরা বোধ হয় সকলেই শুনে থাক্‌বে।"

"কোন্ সুরেশ প্রসাদ হে?"

"চক্রবর্ত্তী। না ও শুন্‌তে পার, কারণ একটী বৎসর মাত্র সে প্র্যাকটিস্ করবার অবসর পেয়েছিল।"

একজন দীর্ঘশ্বাস ফেলার ভঙ্গীতে কহিল, "মাত্র একটী বৎসর! আহা বেচারা!" আর একজন কহিল, "এ যে প্রারম্ভেই ট্রাজেডীর গন্ধ বেরুচ্ছে!" তৃতীয় কহিল "Hero এবং villain এর সন্ধান ত মিল্‌ল কিন্তু নায়িকা—সেই উচ্ছল যৌবনমত্তা, নিষ্ঠুরা, labelle dame sans merci তিনি কৈ?" অবিন্ একথা কানে না তুলিয়া কহিল, "ট্রাজেডী, কমেডী বুঝিনা ভাই, তবে যা চোখের সাম্‌নে দেখেছি।"

দ্বিতীয়—"ব্যস্ চেপে যাও। তবে দাদা রং টং যেন বেশী চড়িও না, একটু কাট ছাট দিয়েই চালিও।"

অবিন কহিল "আমি কিছু চড়াবও না, কাট ছাটও দেব না। তবে তাকে তোমাদের সাহিত্যিক ভাষায় উলঙ্গ বাস্তব বলতে হয় বল, নগ্ন সত্য

বলতে চাও আপত্তি নেই, তবে যা বল্‌বো তা সত্য ভিন্ন মিথ্যা হইবে না, একথা পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে হলফ্‌ করে বলতে পারি।"

"বহুৎ আচ্ছা। অলমতি বিস্তারেন ভূমিকয়া" বলিয়া ধীরেশ আঙ্গুল দিয়া সকলকে রসনা সংযমের ইঙ্গিত করিল।

অবিন আরম্ভ করিল :—মুকুলিত গৌরব উন্মেষময় জীবনের প্রত্যুষে সুরেশপ্রসাদের আকস্মিক অপঘাত মৃত্যুতে কলিকাতাবাসী যে কিরূপ বিস্মিত স্তম্ভিত এবং বিচলিত হয়েছিল তা আমার সবিস্তারে না বল্‌লেও চলতে পারে। কারণ সে সময়কার খ্যাত এবং অখ্যাত সমস্ত প্রকার সংবাদপত্রেই এ নিয়ে তুমুল আন্দোলন এবং আলোচনা হয়েছিল। তা তোমরা সকলেই পড়ে থাক্‌বে। তবে এই মেধাবী বাঙ্গালী সার্জ্জনের সহসা এই রহস্যময় আত্মঘাতের হেতু কি তা নিয়ে সরকারী ও বেসরকারী বহুবিধ অনুসন্ধিৎসু দ্বারায় বহুবিধ উপায়ে চেষ্টা ও তদন্ত হ'লেও কেহই কোন নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারে নাই। বলা বাহুল্য করোনারের বিচারে মামুলী ভাবে সহসা মস্তিষ্কের বিকৃতি হেতু আত্মহত্যা বলে নির্দ্ধারিত হয়েছিল। এই শোচনীয় অপঘাত মৃত্যু ব্যাপারটী সম্বন্ধে সকলে যা জানে আমি ও তাই জানি। এ যে হত্যা নয় আত্মহত্যা, সে কথাও ঠিক, কিন্তু কার্য্য কারণ সম্পর্কিত জগৎ ব্যাপারে কার্য্যটী সম্বন্ধে সাধারণ অপেক্ষা বেশী কিছু না জানলেও কারণটী সম্বন্ধে আমি এমন কথা জানি, যা আর কেহই জানে না। এবং সেই কথাই আমি আজ বল্‌বো।"

"আমরা যখন মেডিক্যাল কলেজে পড়তুম, ক্লাসে ও পরীক্ষায় সুরেশ প্রসাদ আর সকলকে এত পিছু রেখে চলত যে আর কেউ সহজে তার

নাগাল পেত না। কেবল রমেশ বলে একটি ছেলে বহু আয়াসে তার ঠিক পিছু পিছু উল্লম্ফনে পরীক্ষা-সমুদ্র পার হ'চ্ছিল কোন কোন বার কোন কোন বিষয়ে ধরি ধরি ও যে না করছিল এমন নয়। এক কথায় রমেশ ছিল আমাদিগের মধ্যে সুরেশের একমাত্র প্রতিদ্বন্দী। কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সরস্বতী সুরেশপ্রসাদকেই জয়মাল্য এবং পুরস্কার স্বরূপ তার স্বর্ণ পদ্মের পাঁপড়ি গুলি একে একে মেডেল রূপে উজাড় করে দিয়ে আস্‌ছিলেন। পরিশেষে শেষ পর্য্যন্ত সুরেশ ও রমেশের বিমল বন্ধুত্ব কালক্রমে প্রবল শত্রুতায় পরিণত হয়। তবে একথা এখানে বলা সঙ্গত যে উভয়ের সতীর্থ বাহন এবং পার্শ্বচর দিগের দ্বারায় এ বিষয়ে কম সহায়তা হয় নি।"

সুরেশের জয়ের গৌরব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ রূপে অপ্রতিহত রইল বটে, কিন্তু অপরদিকে সংসার ক্ষেত্রে ভাগ্য দেবী যে তার অদৃষ্ট লিপিতে রমেশের কাছে এমন নিদারুণ এবং মর্ম্মান্তিক ভাবে তাকে পরাজিত করে রেখে দিলেন তা তখন কে অনুমান করতে পেরেছিল ?"

সে ঘটনাটি মোটামুটি এই :—অনেকদিন হ'তেই সুরেশের বিবাহের সম্বন্ধ তাদের পাড়াতেই কোন এক ভদ্রলোকের কন্যার সহিত পাকা হয়েছিল। মাঝে একবার যখন সুরেশের স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়, পশ্চিমের কোন সহরে স্বাস্থ্যান্বেষণে যেয়ে এই পরিবারের সহিত তাহার পরিচয় এবং ক্রমে ঘনিষ্টতা জন্মে। ভদ্রলোকের এক অনূঢ়া বিদুষী কন্যা ছিল। যা'ক ব্যাপারটা যে একটা ছোট খাট রোমান্সে পরিণত হয় একথা তোমাদের বিস্তারিত না বললেও নিজের নিজের মনে কল্পনায় ভরাট করে নিতে পারবে এ বিশ্বাস আমার আছে।"

ছাত্রজীবনে অধ্যয়নই যে তপ, একথা সুরেশ ছাড়া আর কে অধিক অনুভব করেছে ? তার দুইটী ক্ষীণ চক্ষু জাগতিক সর্ব্বপ্রকার মনোরম দর্শনীয় বস্তু উপেক্ষা করে একাগ্রভাবে পাঠ্য পুঁথির মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছিল। তবে একথা ঠিক সুরেশের জীবনের বৈচিত্র্যহীন অধ্যয়ন-তপঃ আশ্রমের শান্তি ভঙ্গের জন্য ঐ ক্ষুদ্র রোমান্সটুকুই প্রথম এবং শেষ হানা।"

আসন্ন পরীক্ষার চিন্তায় পুঁথি-সমুদ্রের মধ্যে যখন সুরেশপ্রসাদ প্রায় সমাধিস্থ; এমন সময় তার পার্শ্বচর হিতৈষী ভগ্নদূতের মত, রমেশের সহিত তার ভাবী পত্নীর উদ্বাহক্রিয়া যে মঙ্গল মত নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ হয়েছে এই রুচিকর সংবাদটী তার কানের গোচর করল। প্রমাণ প্রয়োগের জন্য একখানা সংবাদপত্র সে সংগ্রহ করে আনতে ভুলেনি। তাতে সম্পাদক মহাশয় সংবাদটী উল্লেখ করে বিনাপণে এইরূপ বিবাহ শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবকগণের মধ্যে যাতে আদর্শ হয় এইরূপ মন্তব্য করেছিলেন। রমেশ তার বিয়েতে যে সুরেশকে নিমন্ত্রণ করেনি এমন নয়। হয়ত তার শারীরবিদ্যা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, অথবা অস্ত্রোপচার-শাস্ত্রের, কোন এক পুঁথির মধ্যে সেই নিমন্ত্রণ পত্রখানা পত্র-চিহ্নরূপে বিরাজ করছিল। চোখ বুলাবার তার অবসরই হয়ত ঘটেনি !"

বিয়ের পর আপন ঔদার্য্যগুণে রমেশ কিন্তু পূর্ব্ব মনোমালিন্য কিছুই মনে রাখল না। সে নিজে সপত্নীক সুরেশের বাড়ী যেয়ে দেখা করল এবং পত্নীর সহিত পরিচয় করে দিয়ে গৌরব অনুভব করল। এই অবসরে সে নবপরিণীতা পত্নীর কাছে সুরেশের বিদ্যা বুদ্ধির অপূর্ব্ব প্রখরতা—কেমন করে সে পরীক্ষায় প্রতি প্রতিযোগিতাতেই তাকে হারিয়ে

দিয়েছে এ সব কথার কোন অংশই সে বাদ দিল না। এইরূপে কিছুদিন সে সুরেশের সহিত এমন ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশল যে উভয়ের পার্শ্বানুচরেরাও কোনও বৈচিত্র সম্পাদনের কোন সুযোগ করে উঠ্‌তে পারল না। কেহ কেহ রমেশের তখনকার মনস্তত্ত্ব এইরূপে ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করল যে, বিজেতা হয়ে যদি জয় পতাকা প্রতিনিয়ত পরাজিতের সাম্‌নে সুস্পষ্ট ভাবে উড্ডীয়মান রাখা না গেল তবে সে জয়ে গৌরব কোথায় ? কাহারও কাহারও চোখে তাদের এই ঘনিষ্ঠতা যে বাড়াবাড়ি আতিশয্য বলে ঠেকেছিল সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু রমেশ সে সব গ্রাহ্যের মধ্যে আনে এমন সঙ্কীর্ণ মতি সে ছিল না।

সেটি অতি স্মরণীয় বৎসর। সেই বৎসরই পৃথিবী ব্যাপিয়া কুরুক্ষেত্র বাঁধিয়া গেল। রমেশ বন্ধু সুরেশের হাতে সংসারের অভিভাবকত্বের ভার অর্পণ করে সকলের নিষেধ সত্ত্বেও অনাস্বাদিত এক নূতন জীবনের মোহে ব্রিটিস পক্ষে হাঁসপাতালের কর্ম্মচারীরূপে যুদ্ধাভিযানে যাত্রা করল। সে এমনভাবে ডুব মারলে যে দু'তিন বৎসর তার আর তেমন খোঁজই পাওয়া গেল না। তিন বৎসর পরে সে তার স্ত্রীকে আর মাকে সেখানে নিয়ে যাবার জন্য দেশে ফিরল।

দেশে ফিরে সে আড়ালে অন্তরালে তার স্ত্রী ও বন্ধু ঘটিত এমন সমস্ত মন্তব্য শুনতে পেল অর্থাৎ তার কর্ণপটহ ভেদ করে পৌঁছুতে লাগল যা অকথ্য, অশ্রাব্য এবং আশাতীত রূপে অভাবনীয়।

কিন্তু রমেশ এতে বিন্দুমাত্র ও বিচলিত, অথবা চাঞ্চল্য প্রকাশ করল না। আর দু'একজন অনুচরের মুখে সে সুরেশ সম্বন্ধে অস্পষ্ট এমন সব ইঙ্গিতের আভাস পেত যার অর্থ রমেশের কাছে বেশ সুস্পষ্ট ঠেকৃত।

পরিচিত জনসমাজে তাকে দেখে যে লোকে মুখ টিপে হাসত এমনও তার বোধ হ'তে লাগ্‌ল। কেউ পরোক্ষে কিছু বললে সে স্পষ্টই বুঝতে পারত যে অন্যমনস্ক ও অতর্কিত ভাবে সে কথাটাকে শোনানই তাদের উদ্দেশ্য। সে এ সম্বন্ধে কারও সঙ্গে কোনও রূপ আলোচনা না করে একদিন হঠাৎ কলিকাতা পরিত্যাগ করল। ঠিক এই সময়েই সুরেশপ্রসাদও বিলাত যাত্রা করে সেখানকার সার্জ্জারীর সর্ব্বোচ্চ উপাধি নিয়ে বিপুল গৌরবে দেশে ফিরে প্র্যাকটিস্ আরম্ভ করল।"

সুরেশের সংযত বিনয় নম্র মধুর ব্যবহার, দরিদ্রের প্রতি করুণা, অস্ত্রোপচার শাস্ত্রে বিপুল অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা তাকে অতি অল্পকাল মধ্যেই কলিকাতা মহানগরীতে ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত করল। অদূর ভবিষ্যতেই তার সুনাম ও সুযশ কলিকাতার বাইরেও ছড়িয়ে পড়ল। কেবল আত্মীয় স্বজনের বহু উপরোধেও সে আর দার পরিগ্রহে সম্মত হ'ল না।

এইরূপে সুরেশপ্রসাদ যখন বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেছে, একদিন হঠাৎ অনেক রাত্রিতে কলিকাতার উপকণ্ঠে এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে এক জরুরী ডাক পেল। অধিক রাত্রি বলে সে প্রথমে অসম্মতি জানাল। কিন্তু লোকটীর সকরুণ অনুরোধ এবং উপরোধ যেন সে কিছুতেই এড়াতে পারল না। কর্ত্তব্যপরায়ণ সুরেশপ্রসাদ অবিলম্বে প্রস্তুত হয়ে মোটরে উঠ্‌ল।

রাত্রি প্রায় সার্দ্ধ বার ঘটিকার সময় সুরেশপ্রসাদ নগরোপকণ্ঠে এক প্রকাণ্ড বাড়ীর ফটকে পৌঁছিল। প্রবীন গৃহস্বামী অতি সমাদরের সহিত তাকে নিয়ে বৈঠকখানায় বসাল। গৃহস্বামী বিশেষ ভূমিকা না করে মার্জ্জিত হিন্দি ভাষায় নিজের পরিচয় ও তার স্ত্রীর রোগের বিবরণ বল্‌ল। তাঁর বংশ পরিচয় এবং রোগিনীর রোগের বিবরণ সংক্ষেপে এই :—তারা

দিল্লীর বাদস্যাহআমলের অতি সম্ভ্রান্ত এবং অভিজাত পরিবার। সেই দিন তারা কলকাতায় পৌছেছিল, পরে তাঁর খ্যাতি এবং পারদর্শিতার কথা শুনে তাঁরই স্মরণাপন্ন হয়েছে। রোগিনী তার স্ত্রী। আবহমান কাল হ'তেই সাধারণের অজ্ঞাত, বাদসাহ ওমরাহ প্রভৃতি অভিজাত পরিবারে রূপ ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধির কতকগুলি গুপ্ত প্রক্রিয়া প্রচলিত ছিল এবং আছে। ঐ প্রক্রিয়ার মূলে বনৌষধি প্রয়োগে যুবতীগণের অধরোষ্ঠ স্থায়ীভাবে রঞ্জিত করবার একটী ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ঐ ভেষজ অতি উগ্র এবং বিষাক্ত। অবশ্য উহার প্রতিষেধক বিপরীত ক্রিয়ামূলক ব্যবস্থাও আছে। বিবিধ ভেষজের একটা প্রলেপ ওষ্ঠে কিয়দ্দিনের জন্য পটি সাহায্যে বেঁধে রাখতে হয়। কিন্তু উক্ত পটি কয়েকদিন রাখবার পরই বর্ত্তমান ক্ষেত্রে রোগিনীর ওষ্ঠ ভয়ানক স্ফীত ও দারুণ যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। এই হতেই বিষক্রিয়া অনুমিত হয় এবং আশু মৃত্যুই তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। কিন্তু প্রতিষেধের এক উপায় আছে। ঐ বিষক্রিয়া সমস্ত শরীরে ছড়াবার পূর্ব্বে ওষ্ঠটী অঙ্গ হতে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারলে জীবনের আশা আছে। কিন্তু তাহা অস্ত্রোপচার শাস্ত্রে নিপুণ এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে হওয়া অসম্ভব। ভদ্রলোকটী করুণ কণ্ঠে আরম্ভ করল, "বুঝতেইত পাচ্ছেন আমি কিরূপ বিপন্ন। এ সময় যদি আপনি দয়া করেন তাহলে সব দিক রক্ষা পায়। আপনি আমার স্বদেশবাসী আমার পরিবারের মান সম্মান আভিজাত্যের মর্ম্ম আপনি যেমন বুঝতে পারবেন কোন বিদেশীয় বিজাতীয় ফিরিঙ্গী ডাক্তার তা পারবে না। এই জন্যই এ গভীর নিশিথে আপনার বিশ্রামে ব্যাঘাত দিয়ে আপনাকে দুর্ভোগ ভোগাতে সাহসী হয়েছি।

সুরেশপ্রসাদ ধীর ভাবে কিছুক্ষণ চিন্তা করে কহিল, "আপনি ঠিক বলেছেন যে ওষ্ঠে এইরূপ অস্ত্রোপচার ব্যতিরেকে রোগিণীর জীবনের আশা নেই ?"

ভদ্রলোকটী করুণ ভাবে সুরেশপ্রসাদের দুই হাত চেপে ধরে বলল, "দয়া করুন, আপনি আমার স্বদেশবাসী, আমার মান ইজ্জত রক্ষা করুন।

সুরেশপ্রসাদ ধীরভাবে তাকে আশ্বাস দিয়া রোগিণীর কক্ষে প্রবেশ করল।

রোগিণীর সর্ব্বদেহ বস্ত্রাবৃত ছিল। মুখখানিও একখানা রঙ্গীন মসলিনের ওড়নায় ঢাকা। শুধু ঠোঁঠ দুইটী খোলা ছিল। অধরোষ্ঠ স্ফীত, এক খানা ভেষজ পূর্ণ পটী বাঁধা। রোগিণীর চৈতন্য ছিল না। ধীর ভাবে নিশ্বাস প্রশ্বাস বইছিল। ক্লোরফরম প্রয়োগে যেমন অচৈতন্য সম্পাদিত হয়, অনেকটা সেই রকম।

ভদ্রলোকটী বলিল, "আপনি কিছু মাত্র দ্বিধা করবেন না। বিষ-ক্রিয়ায় ঐরূপ অচৈতন্য আছে। বিষাক্ত অঙ্গ বিভক্ত হওয়া মাত্র চৈতন্য সম্পাদিত হবে। ইহা পরিক্ষিত সত্য।"

সুরেশপ্রসাদ অধিক বাক্য ব্যায় না করে অস্ত্রপাতি বের করে প্রস্তুত হ'ল, এবং নৈপুন্যসহকারে অস্ত্রোপচার আরম্ভ করল। অধরোষ্ঠ যখন প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়েছে রোগিণী অস্ফুট ধ্বনি করে দু'হাতে মুখের ঢাকা ফেলে দিয়ে বিস্ময়বিস্ফারিত চক্ষে সুরেশপ্রসাদের দিকে চেয়ে রইল। ডাক্তার সুরেশপ্রসাদের হৃদপিণ্ডের স্পন্দন যেন সহসা থেমে গেল তার মুখ খানি সহসা মৃতের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার বেপমান হাত হ'তে ব্যবচ্ছেদের ছুরিকা ঝনৎকার করে কক্ষতলে পড়ে লুটাতে লাগল। সুরেশপ্রসাদ পিছু হঠতেই দিল্লীর ওমরাহের পরিবর্ত্তে তৎস্থলাভিষিক্ত এক অর্দ্ধবয়সী

বাঙ্গালী ভদ্রলোককে দেখতে পেল। তার সে সময়কার সেই মস্তিষ্কের বিভ্রান্ত অবস্থাতে ও আকৃতির বহু পরিবর্তন সত্বেও সহাস্য বিদ্রূপোচ্ছন মুখে দণ্ডায়মান তার আবাল্য বন্ধু ও সতীর্থকে সে চিনতে পারল।

"হাঁ এইবার এই ওষ্ঠে আর কামনালোলুপ চুম্বন অঙ্কন করবার সাধ হবে না।"

সুরেশপ্রসাদকে রমেশ সিঁড়ি বয়ে রাস্তা পর্য্যন্ত অনুগমন করে সসম্ভ্রমে বিদায় দিয়েছিল। তাঁর অস্ত্রোপচারের কৃতিত্বে ধন্যবাদ এবং নিপুণ অস্ত্র প্রয়োগের জন্য পারিশ্রমিক দ্বিগুণ ফি ছাড়া অতিরিক্ত ফি নেবার জন্য ও সে বিস্তর সাধ্য সাধনা করেছিল।

গল্পটী শেষ হওয়ার পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কেউ কোন কথা বললে না। মানব জীবনে যে কত দুর্ব্বোধ্য ট্রাজেডী লুকান থাকে এ নিয়ে তরুণ গল্প লেখক প্রেমাঞ্জন বাবু একটা আলোচনার সূত্রপাত করবার উপক্রম করতেই তাকে নিরস্ত করে দিয়ে অবিন্ পুনশ্চ দিয়ে আরম্ভ করল, "উপসংহারে আমার নিবেদন এই যে কেউ হয়ত ওষ্ঠ রঞ্জন প্রণালী অথবা এই অভিনব অস্ত্র প্রয়োগে সন্দিগ্ধ হয়ে আমায় নানা প্রশ্নে বিব্রত করতে পারেন এ আশঙ্কা আমার আছে। আমি সোজা সুজি তাদের জানাচ্ছি সুরেশপ্রসাদ বা রমেশ বলে কাউকে আমি কেন আমার ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষেও কেউ চেনে না। তার একমাত্র কারণ ভূত ভবিষ্যত বা বর্ত্তমান কোন কালেই তেমন কেউ ছিল না।"

বহুদিন পর্য্যন্ত বস্তুতান্ত্রিক গল্প লেখক প্রেমাঞ্জন বাবু এবং কবিতা বায়ুগ্রস্ত অলক বাবু অবিনের সহিত বাক্য বিনিময় করেন নাই।

মা

দখিণ হাওয়া একদিন বেণুবনের শাখায় শাখায় দোল দিল; আধফুটন্ত শিরিষ বকুলের অন্ধ-কুঁড়ির মাঝে প্রাণের পরশ বুলিয়ে দিয়ে চারিদিক ক্ষেপিয়ে তুল্‌ল। শিহরিত উপবনের ফুলের রাশ হ'তে পুলকের বেদনায় বেজে উঠ্‌ল—"সখী জাগো, সখী জাগো—"

মকর-কেতন অলক্ষ্যে ধরণীর পানে চেয়ে হাসলেন। সুধাময়ের সহিত দামিনীর মিলন হ'ল সে অমনি এক কুহকী ফাল্গুন সন্ধ্যায় শ্যামল বাংলার কোণ হ'তে বহুদূরে—তাদের মিলন বাসরে তেমন কোন ঘটনাই হ'ল না। ঘটনাটি একটু অভিনব, এমন কি অনেকের নিকট একটু অপ্রত্যাশিতই ঠেক্‌ল। তরুণ বিলাত ফেরত নীহারকুমারকেই মনে মনে যারা রমেন্দ্র বাবুর জামাতৃপদে বরণ করে রেখেছিলেন, বিষয়টি নিয়ে তাদের মধ্যে দিন কয়েক একটু সাড়াও পড়েছিল তবে বড়লোকের বড়কথা চিরদিনই সাধারণের কিছু অবোধ্য থেকে যায়,—এই আশ্বাস নিয়ে তারা নিশ্বাস ফেল্‌লেন।

দামিনীর বাবার কথা বল্‌তে গেলে সে আধা শতাব্দীর কিছু আগেকার ইতিহাস। নূতন আমদানী ইংরাজী সভ্যতার মোহ তাঁর হাড়ে মাংসে জড়িয়ে গিয়েছিল। পাশ্চাত্য দর্শনের আওতায় পড়ে তাঁর চিন্তাশীলতা যত বাড়ছিল, আত্মীয় স্বজনদিগের তাঁর জন্য দুশ্চিন্তা, সে অনুপাতে কিছুমাত্র কম হয়েছিল না। তারপর যে দিন তিনি বিদ্যাসাগর ম'শায়ের

বিধবা বিবাহের আইনটাকে বলবৎ করবার আকাঙ্ক্ষায় সহসা একটী অনাথা বিধবা মেয়েকে তার জীবনের সঙ্গিনীরূপে বরণ করে নিয়েছিলেন, সে দিনকার দিনটী তার কোলাহল এবং হট্টগোল নিয়ে তাঁর জীবনে একটী স্মরণ করে রাখবার দিন। আত্মীয়স্বজন সমাজ-দ্বারে প্রতীকার চাইলেন এবং শেষে কোন উপায় না দেখে বাধ্য হয়ে তাঁকেই ছাড়লেন,—তিনিও তাদের অমূল্য সাহচর্য্যের জন্য বিশেষ ব্যস্ত হলেন এমন বোধ হ'ল না।

তিন বছরের মেয়ে দামিনীকে তাঁর হাতে সঁপে দিয়ে দামিনীর মা সংসার হ'তে বিদায় নেন। রমেন্দ্র বাবুর দুই স্নেহ বাহুর বেষ্টনীর মধ্য হ'তে মায়ের অভাব অনুভব করবার সুযোগ সে পায় নাই। পরন্তু একটু বড় হয়েই এই বৃদ্ধ শিশুর মাতৃত্বের দায়িত্বভার বেশ গাম্ভীর্য্যের সহিতই গ্রহণ করল। শিশুকাল হ'তেই দামিনী শাসন পেল না, কিন্তু শাসন জারি করবার অধিকার পেল। এম্‌নি করে সুদূর পঞ্জাবে কাঠ্‌খোট্টার দেশে কেমন একটা আব্‌ হাওয়ার মাঝে সে গজিয়ে উঠ্‌ল, যেখান হ'তে অন্তঃপুরের জড়তার ছোঁয়াচ মোটেই তার লাগেনি। দামিনী ঠিক চন্দ্রকলার মত ধীরে ধীরে তার সুধাভাণ্ড নিয়ে এল না, সে যেন আপনা আপনি তার দীপ্তা তেজে জ্বলে উঠ্‌ল—আগুনের শিখা পুঞ্জঃ পুঞ্জঃ বিদ্যুৎ!

তড়িৎ বিজ্ঞানে একটা কথা আছে যে তড়িৎ দীপ্তিও দেয় আবার তার আঘাতেও জ্বালা আছে। কিন্তু স্নেহভ্রান্ত রমেন্দ্র বাবু এমন কথা কোনদিন ভাবেন নি তিনি এই ক্ষুদ্র দীপ্তা শিখাটীর পানে যখনই চইতেন তখনই কি এক সম্ভ্রমে বিস্ময়ে তাঁকে অভিভূত করে ফেল্‌ত। তিনি

অপলক আঁখিতে চেয়ে থাকতেন। সে মুখে তিনি কি দেখতেন তা তিনিই জানেন। কিন্তু দামিনী সঞ্চারিণী লতার মত বৃদ্ধের গৃহখানি ঘেড়িয়া আলোকিতা করলেও, সে স্থিরা সৌদামিনী ছিল না। কাজেই সাধারণের চোখ যেমন সে এড়াতে পারে নি তেমনি তাদের কাছে তা শোভনীয়ও ছিল না। বন্ধুরা অনুযোগ করলে, উত্তরে রমেন্দ্র বাবু কেবল একটু হাসতেন, কখনও বা সংক্ষেপে বল্‌তেন, "এযে সাধারণ নয়, এযে অনুপম, তাই চোখে ঠেকে!"

দেখ্‌তে দেখ্‌তে দামিনীর বয়স সতেরর কোঠা পার হয়ে গেল। কিন্তু সেখানে তা স্মরণ করিয়ে দেবার মত হিতৈষীর অভাবে কোনই উদ্বেগের কারণ ঘট্‌ল না। জড় জগতের প্রকৃতির নিয়মে মানুষের বয়স যে দিন দিন বাড়ে বই কমে না রমেন্দ্র বাবুর কাছে এই অতি সহজ কথাটির ভিতর কোন গোলই ঠেক্‌ল না।

কিন্তু হইলে কি হয়! যত সহজে এবং সুবিধা মত তিনি এই নশ্বর জগতে সবার মায়া কাটাবেন ভেবেছিলেন তাঁর আত্মীয় স্বজন তত সহজে তাঁর মায়া কাটাতে পারে নি। কাজেই কেনই যে তাঁকে তখন পর্য্যন্তও কোন সৎপাত্রের পিতার দ্বারে ধন্না দিতে হ'ল না, তেমন গাছ পাথরের মত মেয়েকে সম্মুখে রেখে তখন পর্য্যন্তও যে কেমন করে তার অন্নে অরুচি ধরে নি, এই সব অতীব বিস্ময়কর কথাগুলো ভেবে ভেবে প্রায় তাদের অগ্নিমন্দা হবার উপক্রম হ'ল। গভীর সাধ্য সাধনার পর সিদ্ধি,—কাজেই সিদ্ধান্তে পৌঁছুতেও বড় গৌণ হ'ল না। রাঢ়ী বিধবার মেয়ে যে কোন গুণী মানী ভদ্রলোক ঘরে ঠাঁই দিবে না এ স্থূল কথাটী একেবারে স্থির নিরাকৃত হওয়ায় সেবারকার মত সকলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল!

এদিকে সুধাময়ের বাপ ছিলেন ডিরোজিওর চেলা। তাঁর কাল যখন ছিল, তখন নাকি পাল্কীর দুই পার্শ্বে নিষিদ্ধ বিহঙ্গম বিশেষকে সঙ্গী না করে চলাফেরা করতেন না। শেষ বয়সেও তিনি জাঁক করে বলতেন,—হিন্দু কলেজের গরাদ টপকিয়ে দুই বন্ধুতে মিলে রহমান চাচার কোপ্তা কাবারের আস্বাদ, সে নাকি ছিল এক দিন!—মরবার আগে সেই যৌবনের সতীর্থ রমেন্দ্র বাবুর সহিত আত্মীয়তার একটা স্থির ভিত্তি করে যেতে পারলেন বলে তিনি অতি প্রসন্ন চিত্তেই সংসার হ'তে বিদায় নিলেন। দিব্যধামে পঁহুছিলেন, একথা তাঁর সম্বন্ধে ভরসা করে বলা যায় না, কারণ পারত্রিক জগত সম্বন্ধে তাঁর ধারণা তেমন সুস্পষ্ট ছিল না।

(২)

রূপ কথার সন্ন্যাসী যেমন কোন এক রাজপুত্রের চোখে কিসের যে কাজল এঁকে দিয়েছিলেন, নীল নিকষে সোনার আঁচড়ের মত সেই দুটি নীল চোখের তারায় সবই নাকি সোনালি হয়ে ফুটে উঠ্‌ত। দামিনীর যুগ্ম দুই আঁখির পাতায় কোন সে যাদুকর কি সে অঞ্জনের রেখা টেনে দিয়ে গেল যার প্রভায় তার চোখে এ বিশ্ব বড় মধুময় ঠেকল! এই আকাশ, এই বাতাস, এই ভোরের আলো তার চোখের সাম্‌নে যেন কে নূতন করে, বিমোহন করে তুলে ধরল। ঊষার প্রথম জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে উন্মুখ হয়ে যখন সে দাঁড়াত, সমস্ত বিশ্বের আনন্দ স্পন্দন যেন সে প্রাণ দিয়ে অনুভব করত। তখন ভোরের সিঁদুর ঢালা আকাশ থরে থরে কি অপূর্ব্ব বর্ণ সম্ভার, তার চোখের সাম্‌নে মেলে ধরত। যতদূর চোখ যায়—সোনার বাংলার পল্লীরাণী, দিগন্ত প্রসারিতা হরিৎবসনা,—আহা

এত রূপ তাঁর!—চোখ যে জুড়িয়ে যায় গো! সে তো এ জগৎটাকে এমন করে কোন দিন দেখেনি! তার চারিদিক ঘিরে কোথা হ'তে এই ঝুরু ঝুরু হাওয়ার খেলা, তুরু তুরু পাতার কাঁপান, কোথা হ'তে কে এমন করে বাঁশী বাজায়! আকাশে মেঘের ছায়াটি নাই, উত্তুরে হাওয়া যেন প্রবেশের পথটি পায় না,—এ কোন সে বিভ্রমময়ী মায়াপুরী!

দেখ্‌তে দেখ্‌তে একটি বছর ঘুমের মত পার হয়ে গেল। বৃদ্ধ মহাকাল তার জীর্ণ খাতার একখানি পাতা উল্‌টিয়ে ফেললেন। কিন্তু এইটুকুর মাঝেই কত বিবর্ত্তন লীলা তার নিঠুর খেলা খেলে গেল।

দামিনী সংসারকে তাঁর শৈশবের পুতুল খেলার মতই রেখেছিল—যেখানে হাসি আছে, কৌতুক আছে, খেয়াল আছে,—আর সেখানে নাই যা প্রয়োজন, নাই শুধু যা বাঁধাবাঁধি, যা'না হ'লেই নয়,—এমন সৃষ্টি ছাড়া কত কি! বিধাতা প্রবীন কিনা বলা যায় না, তবে তিনি দামিনীর এ ছেলে মানুষী মঞ্জুর করলেন না।

লোকে বলে সময় এবং নদীর স্রোত কারও সুখ সুবিধা দেখে না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে আর একটি বছর পার হয়ে গেল। সুধাময় যে কেবল তারই—এ বিপুল বিশ্বে তার ছাড়া আর কারও নয়—একদিন এ কথা ভাবতেও তার হৃদয় নিকুঞ্জের নিভৃততম কোণ হ'তে অশরীরি হাজার পিককণ্ঠ যেন এক সঙ্গে গুঞ্জরিয়ে উঠ্‌ত। সুধাময়কে নিয়ে যে কি করবে তারা দুজনে মিলে সংসারটাকে কেমন করে যে আলোয় হাসি গানে ভরে তুলবে, পাখীর নীড়ের মত তাদের সবে পাতান একখানি বাসা, তাকে যে কি নিবিড় স্নেহে মায়ার বাঁধনে কেমন করে গড়ে তুলবে, এ নিয়ে কল্পনার তুলি দিয়ে সে কত মনোরম ছবিই না এঁকেছিল। বাড়ী

ঘর সাজান হ'ল আরও অনেক হ'ল দামিনীর মনের কোণ ত তাতে ভরে উঠ্ল না।

দেখে এবং ঠেকে দামিনী দু'দিনেই শিখ্ল্ যে কেবল তাদের দু'জনকে নিয়ে এ কুটিল সংসার নয়, তার বাইরেও অনেক খানি আছে।

দামিনীর কুহকময়ী কল্প-লোক তাসের ঘরের মত দু'দণ্ডের কৌতুক দিয়ে ভুলিয়ে কোথায় কেমন করে যেন মিলিয়ে গেল। হাঙ্গরে কাটলে নাকি মানুষ টের পায় না যতক্ষণ না সে জলের সীমা লঙ্ঘন করে। কিন্তু যখন অনুভূতি পায় তখন তাকে এক নিমিষেই অভিভূত করে ফেলে। তেমনি দামিনী একদিন এক কুক্ষণে মোহভঙ্গে জেগে দেখতে পেল যে এক চুমুকে জীবনের যে সুধাপাত্রটি নিঃশেষ হয়ে গেছে, মাধুরিমাময় বিগত রজনীর স্বপন ঘোরের মত তার মোহন স্মৃতির রেশটুকুই যেন মাঝে মাঝে বুকের তলে কাঁপন তুলছিল, তা ছাড়া আর কোন চিহ্নই আর তার নেই। দামিনী যেদিন পেল এমনি করে এক নিঃশ্বাসে তার বেদনার পূর্ণানুভূতিই পেল, এক তিল ও তার কোথাও বাদ গেল না।

দামিনীর সমস্ত দিনের অবসর যেন আর কাটে না। নিজ হাতে তাকে ঘরের কাজ কিছুই করতে হ'ত না। বরং একজনকে ডাকলে পাঁচ-জন এসে সাড়া দিত। তাই তার মনকে রাশ আলগা করে ছাড় দিবার সময় ছিল বিস্তর। কত কথা তার মনের কোণে জমে উঠত। কখনও সে ভাবত এ হেম পিঞ্জরে কেন সে ধরা দিয়েছিল, পায়ে এমন করে শিকলি সে কেন বেঁধেছিল। কখনও সে ভাব্ত গগনচারী ঐ যে ছোট্ট পাখিটী অনন্ত আকাশ সায়রে যেখানে পথের রেখাটি মাত্র নেই, কেমন করে সে পথ খুঁজে নেয়। ঐ যে লঘু চঞ্চল মেঘগুলি কেমন আকাশ

বেয়ে ভেসে চলেছে, না জানি কোথায় কোন সুদূর পিয়াসী তীর্থযাত্রী ওরা! আহা কি স্বাধীন উন্মুক্ত জীবন ওদের।

ওগো তার নাই কি? তার মত স্বামী কয়জনের হয়?—ললাটে যার মহিমার ভাতি, অকলঙ্ক শশীলেখার মত অম্লান সুন্দর সেই মুখ, শিশুর একখানি অনাবিল হাসি যাতে ফুটে রয়েছে! সে মুখের দিকে একবার চাইলে চোখ আর যে ফেরান যায় না,—মনে হয় ভগবান যেন শুধু ভুল করেই একে এখানে পাঠিয়েছেন,—যা এমন সুন্দর, যা দেবতার নির্ম্মাল্যের মত এমনই শুচি। এক এক সময় সম্ভ্রমে ভক্তিতে দামিনীর মাথা আপনা আপনি লুটিয়ে পড়্‌ত। কিন্তু হায়! সুধাময়কে সে যেমন করে যতটুকু করে তার নিজের মাঝে হারা পেতে চায় তেমনিটি ত আর মিলে না। বিদ্রোহী দামিনীর মন শতেক চেষ্টাতেও দেবতার সেই অপার্থিব করুণার দান তেমন করে মাথায় তুলে নিতে পারল না। দামিনী মনের মাঝে তর্ক তুলে,বার বার করে সে নিজেই হার মানে; সমস্ত অপরাধের বোঝা নিজের মাথায় তুলে নেয়—তবু আবার তার বুকের মাঝে পেলব ফুলের কুঁড়িটির কাঁটার মত ব্যথার ভাগটুকুই কি জানি বেশী করে বেজে উঠে।

এমনি করে দামিনীর হৃদয়ময় যখন কালো কালো করাল ছায়া স্তরে স্তরে জমে উঠ্‌ছিল তখন একদিন পূর্ণিমার চাঁদের মত একখানি সোণার চাঁদ তার কোল জুড়ে এসে বস্‌ল। দামিনীর উদ্‌ভ্রান্ত ক্লিষ্ট মন যেন আশ্রয় পেয়ে বাঁচল। দামিনী শিশুর সেই নবনীত সুকোমল অঙ্গখানি বুকের তলে চেপে ধরে চোখের জল জোর করে ঠেলে ফেলে, আবেগ ভরে সেই মুখখানি চুমোয় ভরে দিয়ে বল্‌ল "আমার গোপাল, আমার মাণিক, আজ আর আমার কিসের অভাব!"

৩

মনে যথন ব্যথার গুঞ্জন রুদ্ধ আবেগে গুম্‌রে উঠে তখন মানুষ তাকে বদ্ধ ঘরের রুদ্ধ হাওয়া থেকে মুক্ত করে ছাড়া দিতে চায়। দামিনী কনককে কোলে নিয়ে এসে জানালায় বস্‌ল। চৈত্রের সন্ধ্যা তখন ধীরে ধীরে তার গৈরিক বাস নিয়ে পৃথিবীর বুকে নেমে আস্‌ছিল। তৃতীয়ার ক্ষীণ চাঁদ সবে মাত্র মেঘের কোন্ হ'তে উঁকি মেরেছে। বাইরে তাদের ছোট্ট বাগান খানি ঘিরে আলো ছায়ায় গলাগলি। সারবাধা ছোট বড় কত রকম ফুলের গাছ, দূর হ'তে তেমন ভাল দেখা যায় না। জানালার নীচে একটা হেনা গাছ। দুরন্ত বাতাস তাকে নিঃস্ব করে দিয়ে বাগানের চারিদিকে যেন কি এক নূতন কৌতুকে মাতামাতি করছিল। অদূরে ফোয়ারার ঝিরঝির শব্দটুকু ক্রমেই নীরব হয়ে অস্‌ছিল। চারিদিকের মৌন সৌন্দর্য্য নিয়ে এই বিশেষ রাতখানি তার কল্পনা প্রিয় প্রাণটাকে যেন কোন্ সুদূর অতীতের একখানি অদৃশ্য মায়ালোকের দিকে টেনে নিয়ে গেল। দামিনী আনমন হয়ে ঝাপ্‌সা আলোকে বাইরের পানে চেয়ে রইল, সেই ঘন কুয়াসার আবরণ ভেদ করে তার মানস পটে কান্না, হাসি, মান, অভিমান নিয়ে ভেসে উঠ্‌ল—সেই ভুলে যাওয়, পায়ে ঠেলা অতীত কৈশোর আর সেই কৈশোর সঙ্গী নীহার কুমার। কেমন করে সমস্ত মালঞ্চখানি উজালা করে যেন এক বোঁটায় দুটি কুঁড়ি হয়ে তারা ফুটেছিল। কেমন করে তারা একই বাতাসে একই আলোকে বেড়ে উঠেছিল। তার পর? দামিনীর চমক ভাঙ্গল। তার উদাস বিভ্রান্ত চোথ দুটি সুধাময়ের পড়বার ঘরের উপর পড়্‌ল। তখনও সে ঘরে বাতি জ্বলছিল। দামিনী অনেক্ষণ সেই দিকে চেয়ে

রইল। জানালা দিয়ে হা হা করে একটা দমকা বাতাস এসে তার ঘরের ক্ষীণ দীপটীকে বিপর্য্যস্ত করে তুলল। সে তার চোখ ফিরাল, একটা বুকভাঙ্গা দীর্ঘনিশ্বাস সেই বাতাসে মিলিয়ে গেল। দামিনী চেয়ে দেখল তার বুকের ঘন আবেষ্টনের মধ্যে কনক কখন নিঝুম ঘুমিয়ে পড়েছে। তার সেই ঘুমন্ত মুখখানি তুলে বুভুক্ষিত নয়নে কতবার সে দেখল, কতবার নিমীলিত আঁখির পাতা নিবিড় চুম্বনে আচ্ছন্ন করে দিল। দামিনীর দুই গণ্ড বয়ে মুক্তার পাতির মত স্বচ্ছ অশ্রু বিন্দু ঝর্ ঝর্ করে নিঝোরে ঝরে পড়ল। সে আর কেউ দেখল না। আকাশের ক্ষীণ চাঁদ শুধু ম্লান চোখে এই সকরুণ দৃশ্যের সাক্ষী হয়ে রইল। বছরের অনেক তিমির ঘন তমিস্র নিশীথিনী এমনি বিনিদ্র নয়নে তাকে জাগতে হত। এদিকে সুধাময় চিরাভ্যস্ত কর্ম্মী তাপসের মত রাতের পর রাত কাটিয়ে দিত। সে মুখে ক্লান্তির ছায়াটী মাত্র ছিল না। আনন্দের দীপ্তি, সাফল্যের গরিমা যেন তখনও সে মুখ খানিতে ফুটে বেরুচ্ছিল। দামিনী অনেকক্ষণ বাইরে দাড়িয়ে অপেক্ষা করল, তারপর দ্বিধায় সঙ্কোচে অতি ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকল। টেবিলের উপর একটা ক্ষীণ ছায়া কেঁপে উঠতেই সুধাময় চমকে পিছু ফিরে হেসে উঠল। ভূতের দৌরাত্ম্য সম্বন্ধে কি একটা ঠাট্টা করতে যেতেই হঠাৎ কথার মাঝখানে একেবারে থেমে গেল। মর্ম্মর পাথরের খোদিত পাষাণ প্রতিমার ন্যায় প্রাণহীনা পাংশু বিবর্ণা এ কাকে সে তার সামনে দেখছে। এ ত বিদ্যুৎ-বরণী অগ্নিজিহ্বা লেলিহান শিখারূপনী দামিনী নয়, ঐ যে তার লোকান্তরিতা প্রেতমূর্ত্তি! যার অঙ্গের দ্যুতি হীরকের দীপ্তির মত মুহূর্ত্তে শতধা ঠিক্‌রিয়ে পড়ত, কয়দিনের মধ্যে কেমন করে সে এমন নিষ্প্রভ হয়ে গেল। জড় জগতের তত্বান্বেষী

ব্যবহার-জীবি-জীব-জগতের প্রাণের খেলা ধরতে পারল না। কিন্তু আজ নিজের বুকে যেন তার সুস্পষ্ট স্পন্দন পেল। সুধাময় আবেগ ভরে দামিনীর দুইটী হাত চেপে ধরে ব্যথিত কণ্ঠে অভিমান ভরে বল্‌ল, "এমন অসুখ তাকি আমায় একবার বল্‌তেও নেই?" দামিনীর মুখে কি এক ঔদাস্যের হাসি ফুটে উঠ্‌ল। সুধাময় অনুতপ্ত হয়ে ভাবল নিজের ক্রটীকে ত কিছুতেই এমন করে মার্জ্জনা করা যায় না। নিজে ডাক্তারের বাড়ী বেয়ে ডাক্তারকে ডেকে আনল। ডাক্তার এসে অসুখের অবস্থার কথা পাঁতি পাঁতি করে খোঁজ নিল, ঔষুধ এবং শুশ্রূষার অতি নিখুঁত বন্দোবস্ত করে গেল। এইরূপে সুধাময় নিজের কর্ত্তব্য কড়ায় ক্রান্তিতে সুষ্ঠুভাবে পালন না করা পর্য্যন্ত কিছুতেই সোয়াস্তি পেলনা।

দামিনী লেবেল আটা ঔষুধের শিশিগুলি একে একে জানালা গলিয়ে নর্দ্দমায় ছুড়ে ফেল্‌ল। সন্ত্রস্থ বাড়ীর ঝি চাকর কেহই আর এ কথা মুখ ফুটে সুধাময়কে জানাতে সাহস করল না।

দামিনী তার ঘরের দোর বন্ধ করে দিল। তার পর কার উদ্দেশ্যে তার কম্পিত দু'খানি হাত যুক্ত করে, সজল নয়নে, কাতর কণ্ঠে ডুকরে উঠল, "ওগো পাথরের দেবতা, তুমি এমন করে আড়াল হ'য়োনা, তুমি ছোট হও, তুমি আমার কাছে নেমে এস।"

(৪)

একদিন সুধাময় যখন তাড়াতাড়ি করে বাইরে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল দামিনী এসে তার দরজা আগ্‌লিয়ে দাঁড়াল। দামিনী ইচ্ছা করেই বাইরের ঘরের এদিকে বড় অসত না, ইদানীং একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছিল।

দামিনী বল্‌ল, "আমার একটা কথা শুন্‌বে ?"

সুধাময় হেসে বল্‌ল, "কাল যখন বিধাতা দিয়াছেন তখন তার ব্যবহার করাই সমাচীন, কিন্তু কথা মোটে একটা কেন ?"

দামিনী কি যে কইবে সব ভুলে গেল। কতক্ষণ পর্য্যন্ত সে মাথা নীচু করে নির্ব্বাক দাঁড়িয়ে রইল। তার পর ধীরে ধীরে বল্‌ল, "এত টাকা কড়ি আমাদের কোন্ প্রয়োজন ? তোমার যা আছে সেই তো যথেষ্ট, তা ছাড়া তুমি জান আমার বাবাও আমায় কিছু কম দিয়ে যাননি। শুধু শুধুই এত টাকা দিয়ে আমরা কি কর্ব্বো !" সুধাময় তার চিবুক ধরে একটু ঝাকুনি দিয়ে বল্‌ল, "এই কথা !" অপরিসীম কুণ্ঠা ও লজ্জায় দামিনীর মুখ চোখ আরক্ত হয়ে উঠ্‌ল। তার সহসা মনে পড়ে গেল যে কেবল তার নিত্য নূতন খেয়ালের জন্য যে ব্যয়টা হয় সে ও তো কিছু কম নয়। আলাদিনের প্রদীপের মত কোন ভৌতিক উপায়েও তো তা পূরণ হয়না। হায়রে এর আগে এই সহজ কথাটুকু কোন দিন ভেবে দেখ্‌বারই তার অবকাশ হয়নি।

দামিনী ধীর নম্র ভারী গলায় কহিল, "তুমি দেখে নিও এইবার আমি ঠিক চলব।" সুধাময় তার গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে না হেসে থাকতে পারল না। তারও মনে পড়লো দামিনী অনেক দিন আর কোন নূতন ফরমাস করে নাই। একটু হেসে দেরজটা খুলে এক তাড়া নোট হাতে দিল।

দামিনী সে গুলো নিমেষ মধ্যে টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেলল। তার পর কোন মতে কান্না চেপে বিস্মিত সুধাময়ের সাম্‌নে দিয়ে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল। সুধাময় একটু মনোযোগ করে চেয়ে দেখলেই বুঝতে পারত যে আজ দীপ্তা দামিনীর সে কি দীনা বেশ! সে আজ সম্পূর্ণ

নিরাভরণা ছিল। নারীত্বের শ্রেষ্ঠ সুখ ও সম্পদ হ'তে নিজেকে যে নারী প্রবলরূপে নিষ্ঠুররূপে প্রবঞ্চিতা কল্পনা করে, বহিরাভরণ কতটুকু তার সে ক্ষুধা সে অভাব পুরণ করতে পারে? সুধাময় তার আয়ত দুই চক্ষু যথেষ্ট বিস্ফারিত করেও কিছু বুঝতে পারল না। এই নিদারুণ দুঃখের নির্ম্মমতা তার চোখে ধরা দিল না।

দামিনী আবার শয্যা গ্রহণ করল। মরণাতুর হরিণ শিশুটীর মত যাতনায় ছট্‌ফট্ করতে লাগ্‌ল। কিন্তু কোন্ সে বিষাক্ত তীর, তার মর্ম্মের কোন্‌খানে বিদ্ধ হয়ে কোন তারটীকে যে ছিন্ন করে দিয়েছিল সে বুঝতে পারল না, কিন্তু ভুগল।

(৫)

সুধাময় কাজের ভিড়ে নেমন্তন্ন রক্ষার মত সময় কিছুতেই করে উঠতে পারল না। যখন দামিনীর পীড়াপীড়ি অনুনয় সমস্তই ব্যর্থ হ'ল তখন দামিনী বস্তুতঃই মুস্‌ড়ে পড়ল। সে যে সুধাময়ের হয়ে তাদের কথা দিয়েছিল। আজ তার সইয়ের বিয়ে কতকরে তাদের বলে গেছে। দামিনীর সঙ্গে কতকাল তার দেখা হয়নি, আজ সে এত কাছে,— দামিনীকে যেতেই হ'ল।

দামিনীর হৃদয় ভরে তখন কেবলই গভীর কান্না মাথা কুট্‌ছিল। সেখানে হাসি আমোদ কিছুই তার ভাল লাগলনা। সানাইয়ের করুণ-তান যেন ছুরির মত তার বুকে বিঁধতে লাগ্‌ল।

আরও বিব্রত এবং অত্যন্ত মানসিক বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়ল, নীহার কুমারের উপস্থিতিতে। দামিনীর নিকট নীহারকুমারের উপস্থিতি অত্যন্ত আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত ছিল, সে এর জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না।

দামিনী না জানি আজ কত দিন পর নীহারকে দেখল! নীহার কি আর সে নীহার আছে! তার সে কষিত কাঞ্চনবর্ণ নিস্প্রভ মলিন হয়ে গেছে। চোখের কোঠায় কে যেন কালি মেখে দিয়েছে। দামিনী লোকমুখে নীহারের দায়িত্বহীন উচ্ছৃঙ্খল জীবন কাহিনীর কথা শুনতে পেত বটে কিন্তু সে কথা সে জোর করেই মন হতে দূর করে দিত। এতদিন পরে নীহারের ধ্বংশাবশেষ কঙ্কাল আজ তাহার সম্মুখীন। দামিনী কিছুই ভেবে পেল না। নীহারত ইচ্ছা করলেই ঘর সংসার পেতে সুখী হ'তে পারত, তার এ সৃষ্টি ছাড়া খামখেয়ালির জন্য কে দায়ী! সে আজ কতদিনের কথা! অতীত শৈশব। চুপি চুপি মনের আনাচে কানাচে উঁকি মারতে লাগল। দামিনী সেই সুধার্ণবের নির্য্যাস যেন নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে চুমুকে চুমুকে আকণ্ঠ পান করতে লাগল। ধীরে ধীরে দামিনীর মর্ম্মের এক নিরালা গোপন কোন হতে নীরব করুণা বেদনায় বেজে উঠল। সংবিৎ ফিরে পেয়ে দামিনী চমকে উঠল। বহুবর্ষের পুঞ্জীভূত জড়তা ও অবসাদ হ'তে আজ কিসের জাগরণ! হৃদয় বীণার তারে তারে এ কিসের অনুসরণ। তার হৃদয় ভরে পুলক বেদনার একি অপূর্ব্ব শিহরণ—এ কোন বিস্মৃত রাগিণীর অপূর্ব্ব মুর্চ্ছনা! দামিনী তার এই অভূতপূর্ব্ব অনুভূতিতে বিস্মিতা চমকিতা এবং অতিমাত্র ভীতা হল। দামিনী সেখানে আর টিকতে পারল না। তার শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে তাড়িত প্রবাহের ন্যায় চঞ্চল রক্তস্রোত প্রবলবেগে বহিতে লাগল। দামিনী অসুখের ভাণ করে তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

তখন রাত অনেক হয়েছে। জোছনা ভাল করে ফুটে উঠেনি।

দামিনী অবনত মুখে রাস্তার ধারের ফটকের দিকে অগ্রসর হ'তে লাগল। অন্যমনস্কভাবে পিছনে তাকাইতেই দেখতে পেল একটা লোক দ্রুতপদে যেন তার দিকেই অগ্রসর হচ্ছে। দামিনী মুহূর্ত্তে তড়িৎস্পৃষ্টের ন্যায় বিমূঢ়ের মত পথের মাঝে থমকে দাঁড়াল। সম্মুখে নীহারকুমার,—দীর্ঘাকৃতি মুর্ত্তি, অযত্নরক্ষিত রুক্ষ কেশভার তার মুখ চোখের উপর ঝেঁপে পড়ছিল। হাতের আঙ্গুলগুলি যেন শিখার মত। দুইটী চক্ষু যেন দুইটী জ্বলন্ত অঙ্গার খণ্ড, অন্ধকারের ভিতর হতে বুভুক্ষিত হিংস্র জন্তুর চক্ষুর মত তীব্র জ্বালা ভরা দৃষ্টিতে শীকারের উপর নিবদ্ধ। বেপমান দেহযষ্টিকে কোনমতে খাড়া রেখে দামিনী অবনতমুখে অপেক্ষা করতে লাগল।

নীহার কোন ভূমিকা না করে কণ্ঠ সাধ্যমত সহজ এবং স্বাভাবিক করে বলল, "পথের মাঝে এমন করে তোমায় বাধা দেওয়ায় আমি অত্যন্ত লজ্জিত এবং দুঃখিত। কিন্তু এ ভিন্ন আমার গত্যন্তর ছিল না। কারণ হয়ত আর জীবদ্দশায় তোমায় আমায় দেখা নাও হ'তে পারে। কালই হয়ত আমি এ দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি।"

দামিনী এতই অভিভূত হয়ে পড়েছিল, তার সর্ব্বশরীর অস্বাভাবিক উত্তেজনায় এমনই কাঁপছিল যে সে সহজ গলায় কোন কথাই কইতে পারল না।

নীহারকুমারের—কণ্ঠ ভারি হয়ে উঠল, কহিল "কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি আমিই যখন বুঝে উঠতে পারিনা তখন তোমায় আর কি বলব। তবে শীগগীর যে আর ফিরছিনা একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি।" একটু থেমে নিশ্বাস নিয়ে কহিল, "যাক্ এখানকার লেনা দেনা বন্ধন সব চুকে বুকে গেছে। তবুও কি জানি কেন যাবার আগে তোমার কাছে বিদায়

না নিয়ে যেতে পারলাম না। আজ আর তোমায় পথের মাঝে দাঁড় করে রাখব না। আমার যা বলবার আছে কালই তা আমি শেষ করব। আমার শেষ কথাটুকু বলবার অবকাশ দিতে কুণ্ঠিতা হবেনা এ বিশ্বাস আমার আছে। কাল সন্ধ্যার পর তোমাদের বাগানে আমি অপেক্ষা করব।" ছায়া মূর্ত্তির মত নীহারকুমার চোখের সম্মুখ দিয়া ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। দামিনী কম্পিতপদে কোন মতে যেয়ে গাড়ীতে উঠল।

নীহারের উপর দামিনীর বড় রাগ হ'ল। সে কেন এসব কথা এমন করে তাকে বলল! কে একথা শুনাবায় জন্য তাকে মাথার দিব্যি দিয়েছিল? সে চলে যাচ্ছে তাতে দামিনীর কি? কিসের দাবীতে সে এমন অকুণ্ঠ ভাষায় এমন প্রস্তাবে সাহসী হয়? দামিনী মনে মনে সঙ্কল্প করল নীহারের সহিত কোনমতেই সে দেখা করবে না।

দামিনী অসুখের অছিলা করে সমস্তদিন বিছানায় পড়ে রইল সুধাময়কে পর্য্যন্ত সে বাইরে যেতে দিল না। দামিনী নিজের মনের সহিত অনেক বুঝা পড়া করল, তার না যাবার যত রকম সঙ্গত কারণ থাকতে পারে একে একে সে মনের সামনে সে গুলোকে সারি সারি ভিড় করে দাঁড় করাল, তার যাবার পথে যতদূর প্রতিবন্ধক হ'তে পারে সব একত্রিত করল, তবুও হায় শেষ পর্য্যন্ত সে কিছুতেই নিজেকে ধরে বেঁধে আটকে রাখতে পারল না।

নীহার যা বলতে এসেছিল কিছুই সে বলতে পারল না। ভাষায় তা প্রকাশ করা যেন তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। বহুদিনের বহু সঞ্চিত ভাবাবেগে তার কণ্ঠ যেন রোধ হয়ে আসল। দামিনী রাগ করল, "যদি

কিছুই তোমার বলবার নাই তবে মিছি মিছি আমায় এখানে আনলে কেন ?" দামিনী পিছন ফিরে ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে এগুতে লাগল, নীহারকুমার সম্মুখে চেয়ে দুহাতে পথ রুদ্ধ করে দাঁড়াল। তারপর দামিনী সতর্ক হ'বার পূর্ব্বেই সহসা তার হাতখানি তুলে নিয়ে প্রাণপণে নিজের তাপিত বক্ষের উপর চেপে ধরে পরক্ষণেই ছেড়ে দিলে। দামিনী ভয়ে একটু চীৎকার করে পিছু হ'টে দাঁড়াল। উঃ কি হিম শীতল সে পরশ ! উদ্যতফণা ভুজঙ্গ যখন তার তীব্র বিষ ঢালে তার পরশও কি এমনি হিম শীতল, নিঃসার, নিথর !

নীহারকুমার ধীরে অতি সন্তর্পণে তার পকেট হতে একখানা কাগজ বের করে দামিনীর হাতে তুলে দিয়ে বলল, "এ জগতে আমার বলতে খড়-কুটো যা কিছুই আছে সবই ওতে লেখা আছে। হয়ত দুদিন পরে ওতে আমার আর কোন আবশ্যকই থাকবে না। আমার অনুপস্থিতি বা অবর্ত্তমানে তোমার খুসী মত তুমি এর বিলি ব্যবস্থা ক'রবে। তাহলেই আমি অথবা আমার আত্মা তৃপ্ত হবে। আশাকরি এইটুকু তুমি আমার জন্য করবে।" দামিনী বেতসীপত্রের মত কাঁপতে লাগল। তার বেপমান হাত হ'তে কাগজখানা খসে পড়ে ভূয়ে লুটাতে লাগল। দামিনীর নিজেরই কণ্ঠ রোধ হয়ে আসছিল ; তবুও কোনমতে নিজের সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করে শান্ত কণ্ঠে বলল, "আমার ত অর্থের কোনই অভাব নেই !" একটু থেমে বলল, "যদি সম্ভব হত আমি তোমায় আজ ফিরাতেম—অন্ততঃ অনুরোধ করতেম—কিন্তু," কথা বলার শেষ হবার পূর্ব্বেই অস্ফুট চন্দ্রালোকে দীর্ঘাকৃতি এক ছায়ামূর্ত্তি তাদের উভয়ের মাঝখানে এসে থমকে দাঁড়াল ! উভয়ে চমকে পিছু তাকাতেই দেখতে পেলে মর্ম্মর গঠিত মূর্ত্তির ন্যায় অদূরে

সুধাময় দাঁড়িয়ে আছে। অস্পষ্ট—চন্দ্রালোকে তার মুখখানি মড়ার মত সাদা দেখাচ্ছিল। দামিনীর চক্ষু হ'তে সমস্ত আকাশ ভরা জোছনা যেন এক ফুংকারে নিবে গেল। দামিনী ছুটে গিয়ে দু'হাতে সুধাময়ের গলা জড়িয়ে ধরে তার বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লাগল। কি যেন বলতে চাইল কিন্তু অসাড় বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ জড়ত্বে আচ্ছন্ন হ'য়ে আস্‌ল, কিছুই বলতে পারল না। সুধাময় সুকোমল ভুজবল্লীর সেই উদগ্র ব্যাকুল বন্ধন হ'তে ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত করে অসাড় চলৎশক্তিহীন পায়ের উপর ভর করে কোন মতে টলতে টলতে গেল। দ্বাররোধের শব্দ রাত্রির গভীর নিস্তব্ধতাকে শেলবিদ্ধ করে দিয়ে যেন শত বজ্রের নির্ঘোষে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠল। দামিনী ও নীহারকুমার সে শব্দ সেখান হ'তেও অতি স্পষ্টই শুনতে পেল।

লুণ্ঠিতা দামিনী ভূমি হতে উঠে দলিতা ফণিণীর ন্যায় গ্রীবাভঙ্গী করে দাঁড়াল। বজ্র মুষ্টিতে নীহারের দুইখানি হাত চেপে ধরে বল্‌ল, "চল, এখন আমায় যেখানে নিয়ে যাবে আমি সেইখানেই তোমার অনুসরণ করব,—এমন কি নরক পর্য্যন্তও।"

ঝড়ের মুখে শুষ্ক তৃণ গুচ্ছের ন্যায় দামিনী দিশেহারা ভাবে ছুটিল। নীহারের কূলছাপান আদরের বন্যায় পড়ে দামিনী একটানা ভেসে চল্‌ল। দামিনী নিজের মনকে আঁথিঠারে এই বলে বুঝাতে লাগল—সে যা চেয়েছিল তা সে পেয়েছে, এতে কোন দ্বিধা দ্বন্দ্ব নেই। সে নিশ্বাস ছেড়ে যেন বাঁচলো। কেবল এইটুকু দুঃখ তার মনে গাঁথা রহিল,—যদি সে তার জীবনের দুঃসহ দুর্ব্বহ মুহূর্ত্তের স্মৃতির শেষ দাগটুকু একেবারে নিঃশেষে মুছে ফেলতে পারত!

(৬)

কিন্তু বিশ্বের নিয়ন্তা যাকে অকূলে ভাসিয়েছেন তার কূল ব্রহ্মাণ্ডের কোথায়ও মিলে না। অন্ধ অদৃষ্টের তীব্র অট্টহাস্যের মত দামিনীর ভাগ্যাকাশ জুড়ে একখানা তড়িৎ শিখা জ্বলে উঠল! দামিনী চোখ মেলে দেখতে পেল তার একমাত্র অবলম্বন, যাকে অটল বলে একদিন নির্ভর করেছিল, সেই বনস্পতি বজ্রাহত। ছিন্ন ব্রততীর মত দামিনী ভূমিতে আছাড়িয়ে পড়ল। আইনের চখে নীহার দামিনীর কেহই নহে, এবং অচিরেই নীহারের এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় দামিনীকে স্পষ্টই বুঝিয়ে দিল! দমিনী ঔদাসীন্যভরে শেষ স্মৃতি নিদর্শন কাগজখানার আর কোনই খোঁজ করল না! নির্ব্বিরোধে দামিনী পথে এসে দাঁড়াল।

দামিনী যা নিয়ে একদিন খেলা করেছে, নিষ্প্রয়োজন বোধে ফেলা করেছে, পায়ে ঠেলেছে আজ তারই ক্ষুদ্র কণার অভাবে তাকে পীড়া দিতে লাগল। আশ্চর্য্যের কথা এই যে এত দুঃখ, এত ঝঞ্চাবাত, যার মাথার উপর প্রলয় গর্জ্জনে বয়ে গেছে তারও আজ আকাশের নীচে মাথা গুঁজবার একটু ঠাঁই চাই, ক্ষুধায় অন্ন চাই। দামিনীর সমস্ত হৃদয় আলোড়িত করে সন্দেহ ও দ্বিধার আগুণ ধিকি ধিকি করে জ্বলে উঠতে লাগল, এ জগৎ ব্যাপার কি এমনই অসঙ্গত এমনই অনিয়ন্ত্রিত? এর কোথায়ও এতটুকু ফাঁক নাই, ত্রুটি নেই, বিচ্যুতি নেই! মনের কোণে শত বিদ্রোহ ঝঞ্চা গর্জ্জে উঠল, ভুলের কি সোধরাবার উপায় নেই, দোষের কি মার্জ্জনা নেই। সে জানে বড়পাপের বড়শাস্তি। কিন্তু তবুও এতবড় শাস্তি কেউ কখনো মাথা পেতে নিয়েছে? আবার তার মন অবসাদে নুয়ে পড়ল. না না, ছি ছি

তাও কি হয়? পৃথিবীর সমস্ত তাপরাশি দিয়েও তার সেই নিমেষের একরত্তি ভুলের দাগ ধুয়ে মুছে ফেলা যায় না!

এমনি দারুণ বিভীষিকাময় চিন্তার ভারে প্রপীড়িতা হয়ে আকাশ-কুসুম রচনার দিবাস্বপ্নে দামিনীর দিন কাটতে লাগল। এক একটি মুহূর্ত্ত যেন এক একটী দীর্ঘ বৎসরের মত মনে হতে লাগল। কিন্তু ক্রমে দিন যেন আর কাটে না।

একদিন গেল। দু'দিন গেল। তিনদিনের দিন দামিনীর নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হ'য়ে আস্‌ল। কে যেন হাত ধরে তাকে তার অজ্ঞাতে সহরের সেই এক বিস্মৃত অতীত পুরাতন পরিত্যক্ত কোণের দিকেই টেনে নিয়ে চল্‌ল। দামিনী সেই অদৃষ্ট অজ্ঞাতের আদেশে বুকে বল বাঁধল। সদর দরজার সম্মুখে যখন সে পৌঁছিল তখন সন্ধ্যা অতীত হয়ে গেছে। চোরের মত কম্পিত বক্ষে গোপন পদক্ষেপে সে ভিতরে ঢুক্‌ল। বজ্রের ছাপ যেন সেখানেও পড়েছে। পোড়া বাড়ীর মত একেবারে নিস্তব্ধ। বাগানের ছোট ছোট গাছগুলো কেমন বিশৃঙ্খলা হয়ে পড়েছে। মাধবী কুঞ্জগুলি আর তেমনটি নেই। বকুলতলায় রাশি রাশি শুক্‌নো পাতা জমে রয়েছে। ভোর সকালে ফুল কুড়াতে কেউ যেন আর সেদিকে আসে না। ফোয়ারায় আর জল নেই কেউ যেন এসব আর লক্ষ্য করে না। চারিদিকে কেবলই যেন এক বিরাট ঔদাসীন্য বিশৃঙ্খলতা। দামিনীর দুই পাষাণ চক্ষু ফেটে জল বের হ'ল। দামিনী এমন করে বহুদিন কাঁদে নাই। সেই হতভাগিনীর ছোঁয়া পেয়েই কি সব দিক এমন জলে পুড়ে খাঁক হয়ে গেল? কে জানে। বাড়ীর এক দাসীর সঙ্গে তার দেখা হ'ল। তাকে অনেক সাধ্য সাধনা মিনতি করে সে এইটুকু জান্‌তে পার্‌ল যে খোকা

বাবুর বড় অসুখ। তার কনক কুসুম বুঝি তারই সংক্রামক বিষাক্ত বাতাস পেয়ে অকালে ঝরে পড়ে।

যেখানে সে একদিন রাজরাণী ছিল সেখানে আজ দূরতম ভিক্ষুকের অধিকারেও সে বঞ্চিতা। বাড়ীর দাসীও আজ তাকে অস্পৃশ্যাজ্ঞানে ঘৃণা ভাবে মুখ ফিরায়ে চলে যায়। সে দেখ্‌ল:বিধাতা তাকে লজ্জাবতীর মত নুয়ে পড়বার জন্য সৃষ্টি করেন নি, তার প্রতি অণু পরমাণু বজ্রের নির্ম্মমতা দিয়ে গড়া। দামিনী একদিন যা স্বপ্নেও ভাব্‌তে পারত্‌ না বাস্তব জগতে তা সে অক্লেশে সইতে পার্‌ল।

সুধাময় যে কনককে এই দীর্ঘ এক মাস ধরে এক মুহূর্ত্তের জন্যও নয়নের আড় করেন নি—রাত্রদিন বিনিদ্রনয়নে মহাকালের বিরুদ্ধে সজাগ প্রহরীর মত পাহারা দিচ্ছেন,—এক নিমিষেও কাছ ছাড়া হন নি; ঔষধ নিজের হাতে খাইয়েছেন, পথ্য নিজে তৈরী করেছেন; সে ভারও অপরের হাতে দিয়ে বিশ্বাস পান নি; কেমন করে সে কচি শিশুর মত সমস্ত রাত্রি বুকের উপর রেখে দোল দিয়ে দিয়ে ঘুম পাড়িয়াছেন—দামিনী এই সকল কথা একে একে তৃষিতের ন্যায় আকণ্ঠ পান কর্‌তে লাগ্‌ল। দামিনী বিহ্বল দৃষ্টি দেওয়ালে টাঙ্গান একখানা ফটোর উপরে নিবদ্ধ হ'ল। দামিনী বুভুক্ষুর মত চেয়ে রইল। তারপর তার চোখ যখন অশ্রু আসারে ঝাপ্‌সা হয়ে আস্‌ল তখন সে উঠে উন্মাদের ন্যায় ছুটে গিয়ে সেই চেতনা হীন আলোকচিত্রখানি বুকের উপর চেপে ধর্‌ল, মাতৃহৃদয়ের বহু নিরুদ্ধ বহু সঞ্চিত স্নেহরাশি দুর্নিবার আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠ্‌ল। তার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা বুঝি মিট্‌বার নয়।

কোনরূপ চাঞ্চল্য কোনরূপ উত্তেজনা সুধাময়কে এতটুকু পর্য্যন্ত বিচলিত

কর্‌তে পারল না। যাতে তার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা নির্ম্মমতম আঘাতের বেদনা, তাকে অভিভূত কর্‌তে না পারে, তার বহিরাচরণকে কোনরূপ নাটকীয় দৃশ্যে পরিণত না করে, তার জন্য সে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করল।

সুধাময় সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আস্‌ল। ধীরে ধীরে দামিনীর হাত হ'তে ছবি খানা নিয়ে দেওয়ালে যথাস্থানে টাঙ্গিয়ে রাখল। এবং মর্ম্মহীন প্রস্তর পুত্তলিকার মত নিশ্চল দাঁড়িয়ে দামিনীর কথা বলার অপেক্ষা করতে লাগ্‌ল। দামিনী দু'হাতে তার দুখানি পা জড়িয়ে ধরে একরাশ চুল বিপর্য্যস্ত মেঘভারের ন্যায় তার পায়ের তলায় বিছিয়ে দিলে, সদ্য ঝরা শিশির বিন্দুর ন্যায় অশ্রুর পাতি তার পা দুখানিকে সিক্ত ক'রে দিলে, দামিনী কহিল, "তুমি বিশ্বাস কর, আমি আজও তোমারই; অন্তরতম দেবতা, প্রতি মানবের বুকে যার বাসা, তিনি জানেন আমি তোমারই আর কারও নই, কোনও দিনই ছিলাম না।" চেতনাহীন অকরুণ পাথরের দেবতার কাণে ভক্তের এই পঞ্জরভেদী কাতরোক্তি এই করুণ মর্ম্মবাণী পৌঁছিল না। জড় পাষাণ তেমনি নির্ব্বাক মূক হয়ে রইল। কক্ষ প্রাচীরে ঘা লেগে লেগে কথা কয়টি শূন্যে ফেটে পড়ল।

(৭)

দামিনী প্রথমে ভাব্‌ল তার আর বেঁচে লাভ কি? কেননা ঐ গঙ্গার জলে তার দুর্ব্বহ জীবনের ভার লাঘব করে? আবার ভাব্‌ল, মর্‌বে কেন! যে কোন দিন তার দুঃখ বুঝল না যে কোন দিন ভুলেও তার দিকে ফিরে চাইল্‌ না তার জন্যে? যে তার হিয়ায় হিয়ায় মর্ম্মে মর্ম্মে এই দুঃখের দাহন, এই তুষানল নিজের অনুভূতি দিয়ে কোন দিন বুঝতে চেষ্টা মাত্র না করে, চরম দণ্ড দিয়ে বস্‌ল তার জন্যে? যে অন্ধতার

মার্জ্জিত নীতির ঠুলি বাঁধা চোখে কিছু না দেখে, কিছু না বিচার করে তার অন্ধের যষ্ঠি, নয়নের মাণিককে এমন করে বুক হতে ছিনিয়ে নিল তার জন্যে? দামিনী ভাব্‌ল যদি তার সে উচুমাথা পথের ধূলার মাঝে সে লুটাতে না পারল, যদি তার বুকের ভিতর চিরদিনের জন্যে ঠিক এমনি ধারা রাবণের চুল্লী জ্বালিয়ে দিতে না পারল তবে একা একা জ্বলে পুড়ে আর কি লাভ হল? দামিনী প্রতিজ্ঞা করল—সর্ব্বনাশের অতল তল কোথায় তা সে দেখ্‌বে। তাকে বাঁচতেই হবে।

(৮)

দশটী বৎসর জলের ঢেউয়ের মত চলে গেল। এই দশটি বৎসরের মধ্যে জগতে কত পরিবর্ত্তন ঘটল। কত নূতনের আগমন হ'ল, কত নূতন পুরাতন হ'ল, আবার কত পুরাতন ঝরে পড়ল। সেই ক্ষুব্ধা, সেই অভিমানিনী নারী যে তার হৃদয়ের কতখানি জুড়ে বসেছিল তা আগে সুধাময় এমন করে কোন দিন অনুভব করেনি। নীহারের আকস্মিক মৃত্যুর পর সুধাময় গোপনে তার অনেক অনুসন্ধান করেছিল কিন্তু তার কোন সন্ধানই মিলে নাই। সুধাময়ের তখন মনের কোণে দ্বিধাসঙ্কোচময় নানা বিপরীত ধারায় চিন্তা হ'তে লাগল। কি জানি হয়ত তার উপর ঠিক সুবিচার করা হয় নি। হয়ত দামিনীর তেমন অপরাধ ছিল না। হয়ত দামিনী শুধু তার নির্ম্মম দুর্ব্ব্যবহারেই ক্ষোভে দুঃখে আত্মঘাতিনী হয়েছে। কিন্তু সুধাময় তার অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দৃষ্টি বিস্তার করে দেখতে পেল, দামিনী বাহিরে মরে গেলেও তার মনের পটে তেমনি সজীব রয়ে গেছে।

সুধাময় কনককে বুকে পেয়ে দামিনীর কথা ভুলতে চেষ্টা করল।

কিন্তু কনকের মুখের দিকে চেয়ে, তার কণ্ঠস্বর শুনে, এমন কি তাকে চুম্বন করতে যেয়ে এক এক দিন সুধাময় চম্‌কে উঠত। সে মুখে যে তার সেই মায়ের মিনতিভরা ভাসা ভাসা দুইটী চোখের করুণ চাহনিতে ভরা। সেকি আজও পৃথিবীর দৃষ্টির বাহিরে তার নিষ্ঠুর নির্ম্মমতার বিচার প্রার্থী হয়ে নিশি দিন অপলক আঁখিতে অপেক্ষা করছে, সেকি এমনি করে এখনও তার দিকে চেয়ে আছে?

কনক অতিরিক্ত আদর পেয়ে বড় দুরন্ত হ'য়ে উঠল। সে বাড়ীর কারও কথা শুন্‌ত না। এত বড় হয়েও সুধাময়ের সাথে একসঙ্গে না বসলে তার কোন দিন খাওয়া হ'ত না। এমন কি খেলার সময়টী পর্য্যন্ত সুধাময়কে না হ'লে তার চলত না। কনককে বাড়ী রেখে সুধাময়েরও কোথায়ও এক তিল থাক্‌বার যো ছিল না। ছোট ছেলের কান্না শুন্‌লেই তার মন বড় বিপর্য্যস্ত বিকল হয়ে পড়ত।

সুধাময় যেদিন ব্যবহারজীবি হ'তে বিচারকের পদে উন্নীত হ'ল, সেদিন বন্ধুবর্গের নানারূপ উৎসব ব্যসনে তার বাড়ী ফিরবার নিয়মিত সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল। সেদিন কনক আর তার জন্যে প্রতি দিনের মত ফটকের গোড়ায় অপেক্ষা করে নাই। ভিতরে যেয়ে দেখল কনক ঘরের এক কোণে মুখ ভার ক'রে ব'সে রয়েছে। অভিমানে তার চক্ষু দুইটী ছল ছল করছিল। সে স্কুল হ'তে বাড়ী ফিরে এসে কিছুই মুখে দেয় নাই। অনেক আদর, অনেক চুম্বন, অনেক কৈফিয়তের পর কনকের বিচার বিচারপতি সুধাময় মাথা পেতে নিয়ে তবে অব্যাহতি পেল। তবুও এমনি করে সুখে, দুঃখে, মান, অভিমান নিয়ে আলো ও ছায়াপাতে তাদের দিন বেশ কেটে যাচ্ছিল।

আরও কয়েক বৎসর অতীত হয়ে গেল। কনক যে দিন তার পিতার মুখ উজ্জ্বল করে, ব্যারিষ্টার হয়ে দেশে ফিরল, সুধাময়ের সে একদিন। তাকে বুকে নিয়ে, তার শির চুম্বন করে তার পর আনন্দে ও বেদনায় নারীর মত চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিল। তার আনন্দের অংশভাগিনী আজ কোথায়?

(৯)

স্বেচ্ছাকৃত বিপথে চালিত দামিনীর জীবনের গতি অতি আশ্চর্য্য ক্ষিপ্রবেগে ব'য়ে চল্‌ল। দামিনী যেদিন সগর্ব্বে স্বেচ্ছায় প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে পিছল পথে নাম্‌ল, সে তখন পা পিছ্‌লে ধাপে ধাপে অনেক দূর পর্য্যন্ত নেমে আস্‌ল, পিছনের দিকে সে ফিরেও তাকাল না। আলেয়ার বিভ্রান্তকারী আলোর মত প্রতিহিংসা বৃত্তি যেন তাকে কোন সুদূর ধূমায়িত অস্পষ্ট লোকের দিকে অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ করছিল কিন্তু তার যখন চৈতন্য হ'ল তখন সে তার মোহ নির্ম্মুক্ত স্পষ্ট চোখে দেখ্‌তে পে'ল যে—সে ধাপে ধাপে কোথায় নেমে এসেছে। যে সঙ্কল্প নিয়ে সে এ পথে এসেছিল তাতে তার আর মন সরল না, যেন মনে কোনই সাড়া বা উৎসাহ সে পেল না। সে যে মরে গেছে—এই ভুলটুকু নিয়েই যদি সুধাময়ের সুখ হয় তবে সে ভুল আর ভাঙ্গতে চায় না।

কিন্তু কার্য্য কারণের যিনি কর্ত্তা দামিনীর ভাগ্যে তিনি লিখে-ছিলেন অন্যরূপ। কাজেই ঘটনা পরম্পরায় ঘটলও তাই। যে অর্থ, যে বিষয় বৈভব একদিন দামিনী ধূলি-মুষ্টির ন্যায় পায়ে দ'লে চলে এসেছে, সেই অর্থের কথা নিয়ে যখন একদিন এক মত্তপ লম্পট শ্লেষ করল, দামিনী সে আঘাত সইতে পারল না। নারী চিরদিনই নারী।

দুর্ব্বল, অতর্কিত মুহূর্ত্তে উত্তেজনার মুখে তার জীবনের একটা সূত্র একটু আল্‌গা হ'য়ে গেল। পরে সেই সূত্র ধরে ধরে ব্যাপারটা যখন আরও গড়াতে চল্‌ল দামিনী সেই লম্পটের পায়ে মাথা লুটিয়ে তাকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করল,—"আমায় তোমার যে শাস্তি যে লাঞ্ছনা দিতে হয় দাও, আমি কিছুই বল্‌ব না, শুধু আমি যে কি তা আমার স্বামীকে জান্‌তে দিও না। আমার দোহাই, প্রাণ থাকৃতে তাকে এ শাস্তি দিতে পারব না।" ফল কিছুই হ'ল না। হিংস্র শ্বাপদ মাংসের গন্ধ পেয়ে যেমন অতিমাত্র প্রলুব্ধ হয়, ব্যাঘ্র যেমন সম্মুখে শীকার দেখে হর্ষান্বিত হয়, মদ্যপ সদ্য বিপুল অর্থলব্ধ বিভ্রান্তকারী মদ্যের গন্ধ পেয়ে তেমনি মেতে উঠ্‌ল। দামিনীর বাপের দেওয়া বিপুল-সম্পত্তি,—এত বড় বিষয়টা যে এতদিন পর্য্যন্তও তাকে ফাঁকি দেওয়া হয়েছে,—সে কথা স্মরণ করে, সে যে এত বড় ধূর্ত্ত তারও মনে লজ্জা হ'ল। প্রলুব্ধ মাতাল টল্‌তে টল্‌তে বাইরের দরজার দিকে অগ্রসর হ'ল। দামিনী ঝড়ের মত ছুটে এসে দুই হাতে তার পথ রোধ করে দাড়াল। দৃপ্তকণ্ঠে কহিল—"আমার খুন না করে কিছুতেই তুমি একপা এগুতে পারবে না।" মাতাল উপেক্ষার হাসি হেসে তাকে হেলা ভরে এক পাশে ঠেলে দিল। দামিনীর চক্ষুর সম্মুখ হ'তে জাগতিক সমস্ত দৃশ্যাবলী যেন একে একে ঘন কৃষ্ণ যবনিকার অন্তরালে বিলুপ্ত হয়ে গেল। দামিনী কোন মতে তার শরীরের সমস্ত বল সংগ্রহ করে প্রলয় বেগে তার উপর আছ্‌ড়ে পড়্‌ল। স্খলিত পদ মদ্যপ সে আঘাতের বেগ সহ্য করিতে পারল না। দেওয়ালে মাথা ঠুকে অচেতন হয়ে মেজের উপর লুটিয়ে পড়ল। বিমূঢ়া দামিনী ক্ষণেক বিহ্বলের মত তার অসাড় দেহের উপর বিস্ফারিত দৃষ্টি আবদ্ধ করে

দাঁড়িয়ে রইল। তারপর তার বুকে হাত দিয়ে দেখতে গেল বক্ষ স্পন্দন থেমে গেছে। দামিনী খুনের দায়ে অভিযুক্তা হয়ে হাজতে প্রেরিতা হ'ল।

১০

বিচারের দিন আদালতে লোক ধরে না। বলা বাহুল্য এমন রুচিকর সংবাদটী নানারূপ টীকা টীপ্পনী সহকারে নানাবর্ণে রঞ্জিত করে দৈনিক খবরের কাগজগুলো সাধারণের গোচর করতে কসুর করে নাই। নিষ্কর্ম্মা কৌতুহলী জনতার অবাধ আলোচনার খোরাক অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য বেশ ভাল মতই জুটেছিল।

বিচার আরম্ভ হ'ল। আসামীপক্ষ সমর্থন করতে যেয়ে নূতন ব্যবহারজীবি কনককুসুম তার সমস্ত উদ্যম, সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছিল। কিন্তু হলে কি হয়?

আসামীর বলবার কিছুই ছিল না। এবং যা ছিল, প্রকাশ্য আদালতে কৌতুহলী জনতার সমক্ষে শত কুৎসিৎ বিস্ফারিত দৃষ্টির সাম্‌নে দাঁড়িয়ে তা বল্‌বার নয়। উত্তেজনার বশে জ্ঞানহারা হয়ে যা সে করেছিল মিথ্যা গোপনতার আড়ালে তাকে ঢাক্‌বার কোন চেষ্টাই সে করল না। প্রারম্ভ হতে আগাগোড়া সমস্ত বর্ণনা করে সে স্পষ্ট ভাষায় সমস্ত স্বীকার করল এবং সে যে দণ্ডের জন্য প্রস্তুত তাও অকুণ্ঠ নির্ভীক কণ্ঠে ঘোষণা করল। ফাঁসীর বন্ধন হ'তে মুক্তির লোভ হতে পারে, জীবন তার কাছে এত মহার্ঘ্য, এত লোভনীয় ছিল না। তরুণ ব্যবহারজীবি কনক বড় দমে গেল। আসামীর প্রতি তার অপরিসীম সমবেদনা ও সহানুভূতি যেন কোন কাজেই এল না। আসামী যে নির্দ্দোষ তা তার মুখখানা দেখা মাত্রই কি জানি কেন লোকের দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে

গিয়াছিল। অপর দিকে কনকের মহত্ত্বময় ব্যাকুল আগ্রহ, তার ব্যথিত হৃদয়ের নীরব পরিচয় পেয়ে দামিনীর সুপ্ত নারী হৃদয় অজ্ঞাতে কখন যেন সাড়া দিয়ে উঠল। সে মরবার আগে তার জীবনের নিদারুণ বেদনা, জীবনব্যাপী নিষ্পেষণ, পুঞ্জীভূত জমাট ও রক্তাক্ষরে লিখিত অব্যক্ত ইতিহাস, অন্ততঃ একটী মাত্র ব্যথিত হৃদয়ের কাছেও না বলে যেতে পারে না। কনক সেই নারীর মুখের দিকে চেয়ে তার সেই মর্ম্মান্তিক যাতনাময় জীবনের করুণ কাহিনী শুনতে নিজকে ভুলে গেল, আদালতের কথা ভুলে গেল, বিচারের কথা ভুলে গেল। তার চোখের পাতা আর্দ্র হয়ে এল ; ক্রমে আর তার কোন বাধাই মানল না। জগতের কোটী অসহায়, অত্যাচার জর্জ্জরিতা, দুঃখী নারীর আর্ত্তকণ্ঠের করুণ ধ্বনিগুলি এসে বার বার তার হৃদয়ের তারে আঘাত করতে লাগল।

প্রথম কনক এই প্রকাশ্য আদালতে দাঁড়িয়ে কিছুই ভাল করে বলতে পারল না, সে যাহা বলতে চাইল, বুঝাতে চাইল, সে কথা বড়ই অস্পষ্ট হয়ে গেল। দলিতা, অত্যাচারিতা, জীবনের সহিত তার এই প্রথম পরিচয়। সে আজ যা দেখল, সে আজ যা শুনল, সে আজ যা শিখল, তার এ স্মৃতি-পট হতে তা মুছবার নয়। তার মনে হচ্ছিল যে সে শিশুর মত প্রাণ পেলে কেঁদে লয়। কনক নিজের ক্ষুব্ধ, অসংযত মনকে স্থির করবার জন্য ক্ষণিকের অবকাশ নিয়ে বসে পড়ল। সমস্ত আদালত তখন একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

এবার যখন সে উঠে দাঁড়াল, তার চোখে জল ছিল না, ছিল অসহায় নারীজীবনের শত সমস্যা সংঘাত উত্থিত আগুন। তার চোখের ভিতর হ'তে যেন বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ ঠিক্‌রে পড়ছিল। তার কণ্ঠে আর জড়তা

ছিল না, তার মেঘমন্দ্র কণ্ঠধ্বনিতে সেই স্তব্ধ কক্ষ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠল। শ্রোতৃবর্গ নীরবে চক্ষু মুছতে লাগল।

কনক সমস্ত ঘটনা পরম্পরা কার্য্যকারণ একে একে সবিস্তারে বর্ণনা করে বিচারককে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগল, "ধর্ম্মাবতার, এই নারীর আত্ম পক্ষ সমর্থনের নিশ্চেষ্টতাই প্রমাণ দিতেছে যে সে নির্দোষ। সে যা করেছে মদ্যপ লম্পটের অত্যাচার হ'তে আত্মরক্ষার জন্য, তার স্বামীর মান রক্ষার জন্যই তাকে তা করতে হয়েছে! অবস্থাধীনে ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে মানসিক বিপুল বিপ্লবের মাঝে বিপর্য্যস্ত বুদ্ধিভ্রংশ হওয়াতেই একাজ তার দ্বারা সম্ভব হয়েছে। এতদ্ভিন্ন তার সম্মুখে দ্বিতীয় পন্থা নাই, এই জন্যই এই নারী ক্ষমার্হ, নিরপরাধ। মানুষকে শুধু মানুষের মনগড়া আইন অনুশাসন দিয়ে বিচার করলেই যথেষ্ট হবে না ; মানব সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এমন দিন এসেছে যে মানুষ কিছুতেই তাতে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। পরন্তু মানুষকে মানুষেরই প্রাণ দিয়ে মানুষেরই অনুভূতি দিয়ে বিচার করতে হবে। দণ্ডদাতার উচ্চ আসন হতে হেলাভরে অসহায়তার স্কন্ধে সমস্ত দোষের ভার চাপিয়ে দিলে বিশ্ব-বিচারপতি তা সইবেন না। এর এমন অবস্থা হল কাহা হতে? যখনই কোন নারী এই পথে আসে তখনি কি দেখতে পাওয়া যায়? তার আদিতে, মূলে থাকে কে? পুরুষ! যে কাপুরুষ এমন করে ভুল সুধরাবার ত্রুটী নিরসনের অবসর মাত্র না দিয়ে চরম দণ্ড দিয়েছে, সর্ব্বনাশের গভীরতম পঙ্কে টেনে এনে সমস্ত অপরাধের বোঝা নিঃশেষে দুর্ব্বলা নারীর স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়ে সরে পড়েছে! হে দণ্ডদাতা, যদি দণ্ড দিতে হয় তবে সেই নির্ব্বীর্য্য, ক্লীব পশুকে তার গোপনতম গহ্বর হতে টেনে এনে, তাকে দণ্ড দাও। যে বর্ব্বর,

মর্য্যাদা অভিমানী মুহূর্ত্তের ভুলের জন্য নির্ব্বিচারে নিঃসহায়া নারীকে,সন্তানের জননীকে অক্লেশে পদাঘাতে পথে বসাতে পারে, তাকে খুঁজে পেতে নিয়ে এস, নিয়ে এসে সর্ব্বজন সমক্ষে তাকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দাও। ন্যায় দণ্ডের মর্য্যাদা রক্ষা কর।

বক্তব্য শেষে কনক শ্রান্ত হয়ে বসে পড়ল। জুরিরা সকলে মিলে এক বাক্যে নির্দ্দোষ বলে ঘোষণা করল। বিচারপতি নতমস্তকে বিচারাদেশ বর্ণনা করল। আদালতে সমবেত দর্শকমণ্ডলী হর্ষধ্বনি করে উঠল। সেই হর্ষধ্বনির মধ্যেও কার বক্ষ পঞ্জর ভেদ করে একটা চাপা কান্নার ধ্বনি কোথায় মিলিয়ে গেল। কেউ শুনল না।

কনক আসামীর সঙ্গে দেখা না করে বাড়ী ফিরতে পারল না। কনক যেয়ে দেখল সদ্য মৃত্যুর করাল গ্রাস হতে মুক্তি,নারীর—দলিতা, পিষ্টা, বহু জর্জ্জরিতা, তার মনের অন্ধকারময় নিস্তুতি কোঠায় এতটুকু মাত্র আশা ও আনন্দের দীপ্তি দিতে পারে নাই। সীমাহীন অশ্রুবন্যার মাঝে যেন তার কূল কিনারা ছিল না। কনককে দেখে সে দুহাতে দুচোক ঢেকে আকুল ভাবে কাঁদতে লাগল। বহুদিনের বহু সঞ্চিত জমাট কান্নার উৎস যেন আজ কিসের স্পর্শে খুলে গেছে। কনকের মনও যেন কেমন করে উঠল। কেমন করে যে সে তাকে সান্ত্বনা দিবে ভেবে ঠিক করতে পারল না।

সুধাময় ধীরপদক্ষেপে সেই কক্ষ মাঝে প্রবেশ করে আবেগ ভরে দুই চোখের করুণ স্নেহ দৃষ্টিতে কনকের দিকে চেয়ে রইল। তার পর গলা স্পষ্ট করে নিজেকে যথাসাধ্য দমন করে জানাল, যে নারীর কোলে সে জন্মলাভ করেছিল, যে নারী তাকে দশমাস দশদিন গর্ভে ধারণ করে জন্ম দান করেছিল,—এ সেই নারী।

বজ্রাহতের ন্যায় কনক মুহ্যমান স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু সে ক্ষণিকমাত্র। কনক ছুটে গিয়ে ক্ষুদ্র শিশুর মত তাকে জড়িয়ে ধরে তার বুকে মুখ লুকাল। তারা দুজনে অনেক কাঁদল। সে কান্নার শেষ নাই, অবধি নাই। ক্ষণকাল পরে কনক উঠে দাঁড়ায়ে তার হাত ধরে কহিল, "মা ঘরে চল।"

অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মিছটা এসে তার মাথায় একখানা আশীর্ব্বাদের রূপ ধারণ করে বিজয় মুকুট পরিয়ে দিল। তার চোখে অপার্থিব অমর লোকের দীপ্তি ফুটে উঠ্‌ল।

দামিনী মরে গেল, তার চিতাভস্মের শেষ কণা হতে সুধামাখা হাব ভাব নিয়ে ঐশ্বর্য্যময়ী শাশ্বত মা উঠে এলেন।

কনক মায়ের হাত ধরে লোকালয়ের কোলাহল হ'তে বহুদূরে একখানি খড়ে বাঁধা জীর্ণ কুটিরে গিয়া উঠল। সুধাময়ের নয়ন ভোলান সহস্র আরাম উপভোগের আধার প্রাসাদোপম সৌধের শেষ রেখাখানি দূরে বহু দূরে, অনেক পেছনে সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। ভট্টাচার্য্য পাড়ার চণ্ডীমণ্ডপে সকলে বেশ গোল পাকিয়ে বসে ছিল। ভরা কলির দুর্গতিতে শাস্ত্রজ্ঞ ভবকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় তার মজলীসের সকলকে সেদিনকার আদালতের সমস্ত নির্লজ্জ জঘন্য ব্যাপার সবিস্তারে বর্ণনা করে রুদ্ধ আক্রোশে কহিলেন," আজকালকার মাগীগুলাও যেমন নচ্ছার, ছেলেরাও তেমনি বেহায়া। ধর্ম্ম কর্ম্ম সব রসাতলে গেল, সব রসাতলে গেল।"

নিবন্ত কলিকাটা ফুকাইতে ফুকাইতে রামকান্ত কহিল, "দাদা, কলির চার পোয়া ঘনিয়ে এসেছে যে!"

রূপোপজীবিনী।

রাজীবলোচন বাবু তাচ্ছিল্যের স্বরে কহিলেন "তাহ'লে তুমিই কমলা।" বলিতে বলিতে তাহার মুখ তিক্ত ও বিস্বাদভরে বিকৃত হইয়া উঠিল।— "মানুষের মুখের দিকে চেয়ে তার মন সম্বন্ধে এত বড় ভুল আমি জীবনে দু'বার করেছি বলে মনে হয় না। যা আজ তোমাকে দেখে কল্লাম।" এইখানে তাহার অজ্ঞাতে হঠাৎ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বাতাসে মিলাইয়া গেল।—"আর যে জন্য এসেছি এখন সেই কাজের কথাই পাড়া যাক। আমার নাম রাজীবলোচন রায়, চিলহাটীর জমিদারদের আত্মীয়। সম্পর্কে আমি সুরেশের মামা। আজ আমারও কর্ম্মভোগ যে, যে জেঠার বাড়ীর ছায়া জীবনে কখনও মাড়াইনি, আজ এই বয়সে জীবনের সন্ধ্যায়—একটা সংসারের মঙ্গলের দিকে চেয়ে পুত্রের হিতের জন্য মুমূর্ষু জননীর অন্তিম অনুরোধে তাই আমায় করতে হ'লো। আর যাকে ছেলেবেলায় বুকে পিঠে ক'রে মানুষ কল্লাম, যার উপর এতবড় একটা সম্মান নির্ভর কচ্ছে—" রাজীবলোচন বাবু কথা কয়টি শেষ করিতে পারিলেন না। রাজীবলোচন বাবু এতক্ষণ একতরফা এক পক্ষের ক্ষতি ও বেদনার দিক দিয়া বিচার করিতেছিলেন। সেই দুঃখ বেদনাকে বাস্তবরূপে চোখের সামনে রাখিয়া অপরপক্ষকে নির্ম্মমভাবে কঠোর পেষণে নিষ্পেষিত করিতেছিলেন। কিন্তু যাহাকে আঘাত করিতে-ছিলেন সে আঘাত তাহার বুকে কতখানি বাজিতেছিল, তাহার নিষ্ঠুর

পীড়নে তাহার মর্ম্মস্থল কিরূপ করিয়া ক্ষত, বিক্ষত হইতেছিল রাজীব লোচন বাবুর সেদিকে লক্ষ্য মাত্র ছিল না।

মুহূর্ত্তমধ্যে কমলার চোখ দীপ শিখার ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে অতি দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "আমায় দুঃখ দিয়ে কোনই লাভ নাই ; আমি স্ত্রীলোক, তাছাড়া এটা আমার নিজের গৃহ। আপনি যে ভাবে কথা বল্‌ছেন—এই ধরণের কথা শুনবার আমার অভ্যাস নাই। বিশেষ অপরিচিতের মুখে এসব কথা শুন্‌বার প্রত্যাশাও করি না।" বলিতে বলিতে কমলা গমনোন্মুখ হইয়া দাঁড়াইল।

কমলার সেই বিদ্যুৎস্ফুরিত চোখ, মুখ, তাহার ঋজু দেহ যষ্টি, তাহার গ্রীবাভঙ্গী, কথার সতেজ ভাব৷ ক্ষণিকের জন্য রাজীবলোচন বাবুকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। রাজীবলোচন বাবুকে ধীর ভাবে কহিলেন-- "সত্যই তোমার সাম্‌না সাম্‌নি দাঁড়িয়ে, তোমাকে নিজের চোখে দেখে তোমার সম্বন্ধে কেহ সে সব কথা সহজে বিশ্বাস করতে পার্‌বেনা। লোক মুখে শুনেছিলাম তুমি অতি—কিন্তু—"

"না ওতে কোন কিন্তু নেই আপনি যা শুনেছেন তার এক বর্ণও মিথ্যা নয়। যিনি আমায় সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি যে আমায় কি দিয়ে গড়েছিলেন তা তিনিই বোধ হয় জানেন না।"

—"তবুও একথা ঠিক যে তুমি তাকে এমন হাত করেছো, যে তাহার কোন কাণ্ডজ্ঞান মাত্র অবশেষ নাই।"

—"আমায় মাপ কর্‌'বেন—আমি আপনার কথার কিছুই বুঝতে পারছি না। —আপনাকে আমি কেমন ক'রে বিশ্বাস করবো ? আমার জাতি নাই,ধর্ম্ম নাই, ভগবান আছেন কিনা জানি না। যদি নিরপেক্ষ কেউ

উপরে সত্যি সত্যি থেকে থাকেন তবে তাঁরই নামে বল্‌ছি আমি স্থরেশ বাবুকে ইচ্ছা ক'রে এপথে আনিনি। তাছাড়া আমি তার নিকট হ'তে কখনও এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিনি, করবার প্রত্যাশাও রাখি না।"

"তার অর্থ তুমি তাকে এত নীচুস্তরে টেনে এনেছো যে চিলহাটীর রায় বংশের একমাত্র বংশধর গণিকার দেহপণে অর্জ্জিত অর্থে জীবন পোষণ করতেও দ্বিধা বোধ করে না।"

—"আমায় রূঢ় কথা ব'লে কোনও লাভ নাই।"

—"আমারও সে ইচ্ছা নাই। তবে একথা মনে রেখো অল্প দুঃখ ও সন্তাপে মানুষের মন এমন উত্তপ্ত হ'য়ে ওঠে না।"

—"না, আপনার বিরুদ্ধে মনে করবার কিছুই নাই; এবং যদি কাকেও কারোও ক্ষমা কর্‌বার, মার্জ্জনা করবার অধিকার থাকে সে আপনার। আপনি ভাগ্যকর্ত্তৃক যথেষ্টই বিড়ম্বিত হয়েছেন—আর ভাগ্য বশে আমাকেই সে ক্ষতির উপলক্ষ হ'তে হয়েছে। অজ্ঞাতে, অনিচ্ছায় হ'লেও আপনার কাছে অপরাধ যে আমার কতখানি তা' আমি না বুঝ্‌তে পারি এমন নয়।"

—"শুনে বড় সুখী হলুম মা! কিন্তু যা'র এতখানি বুঝ্‌বার ক্ষমতা আছে, যা'র এমন পরের ব্যথা অনুভব কর্‌বার হৃদয় আছে, তার কাছে আমার চাইতে লজ্জা কি? মা! যা তোর কাছে, সবার চেয়ে বড় তোর সেই দরদী হৃদয়-ধর্ম্মের কাছে আমার ভিক্ষা আছে। দেখিস্ মা যেন বিমুখ হ'য়ে না ফির্‌তে হয়।"

—কমলার বিদ্রোহীমন নমিত হইল, তাহার মস্তক অবনত হইল, অলক্ষ্যে তাহার বক্ষ ভেদিয়া একটী দীর্ঘশ্বাস বাতাসে মিলাইয়া গেল।

—"মা আমার বল্‌বার আছে, ধীরভাবে মন দিয়া শোন মা!"

কমলা বুঝিতে পারিল যে অতর্কিত মুহূর্তটীর জন্য সে সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিত, যে মুহূর্ত্তটীকে সর্ব্বদা সন্তর্পণে এড়াইয়া চলিয়াছে—আজ তাহা সমাগত। যে আশঙ্কা আকাশের বজ্রপাতের ন্যায় তাহার মাথার উপর নিয়ত উদ্যত ছিল—দুর্দ্দৈববশে সেই অকল্যাণ মুহূর্ত্ত আজ সমাগত। যে কথা শুনিবার জন্য সে প্রস্তুত হইতেছিল তাহা ঠিক ধারণা করিতে না পারিলেও ইহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল—সে কথা তাহার পক্ষে অতি নিদারুণ, অতি ভীষণ। অতীত কয়টী মাস ঘুমের ঘোরে সুখ স্বপ্নে সে কাটাইয়াছে। হয়ত সে দিনের অবসান আসন্ন। জীবনে যে স্বাদ সে কখনও পায় নাই, কখনও বুঝে নাই, কয়দিনে তাহাই সে পাইয়াছিল—বুঝিয়াছিল। অমূল্য রতন সে কঙ্করবালুকাময় জীবন পথে কুড়াইয়া পাইয়াছিল তাই জীবনের এই স্বল্প কয়টী মাস সে অতি ভয়ে ভয়ে চকিতে কখন হারায় এই আশঙ্কায় দ্বিধায় কাটাইতেছিল। কখন তার শিথিল বন্ধন পাশমুক্ত করিয়া তাহার অন্তরতম চলিয়া যাইবে, তাই অন্তরের প্রদীপ্ত শিখাময় আরতির প্রদীপ জ্বালিয়া বিনিদ্র নিশায় মর্ম্মে সহস্র দ্বিধার যাতনা লইয়া জাগিয়া কাটাইয়াছে। তাহার আষাঢ়ের মেঘের মত গুরুগম্ভীর মুখখানা রাজীবলোচন বাবুর হৃদয়ে রেখাপাত করিল।

—"মা! আমি তোমায় কোন তিরস্কার, কোনও ভর্ৎসনা করতে আসিনি। আর আস্‌লেও তোমাকে চোখের সাম্‌নে দেখে সে প্রবৃত্তি নেই। আমি তোমায় সমস্ত অজ্ঞানকৃত দুষ্কৃতি, সমস্ত অপরাধের বোঝা হ'তে চিরদিনের মত মুক্তি দিতে চাই। তুমি তাকে যে চোখে দেখ—আমি তাকে তার চেয়ে কম দেখিনা। তুমি তার মঙ্গল চাও, আমিও তাই

রূপোপজীবিন।

চাই। আমি তাকে এতটুকু থেকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি।

—"বলুন, তার যাতে মঙ্গল হয় তা আমি প্রাণ দিয়েও করবো।"

—"এই তো তোমার যোগ্য কথা। বলতেকি আজ চিলহাটির এতবড় সম্ভ্রান্ত বংশ এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় যে কিরূপ বিপর্য্যস্ত হয়েছে তা দেখলে চোখে জল না এসে পারে না। একটা বংশের একমাত্র বংশধর —তার যদি এমন মতিচ্ছন্ন হয়—তবে কি আর সে সংসারের কিছু থাকে? আর তাও যে সে :ছেলে নয়—। সুরেশের মত ছেলে তাকে পাত্রস্থ না করলেই নয়। কিন্তু পাত্রস্থ করে কে? স্বর্গীয় কর্ত্তা মহাশয় থাকতে দীঘির পাড়ের বড় তরপের সঙ্গে কথা এক রকম পাকাই হয়ে গিয়েছিল—কিন্তু তারা এখন বেঁকে বসেছে। কেন তা তোমায় বুঝিয়ে না বল্লেও তুমি বেশ বুঝতে পারছো।"

—"আমি ঠিক না বুঝলেও অনেকটা অনুমান করতে পারছি।"

—"এখন ভেবে দেখ কত দিক দিয়ে—কত ভাবেই না বিব্রত হয়ে পড়েছি।

কমলা অবনত মুখে চিন্তান্বিতমনে নীরবে বসিয়া রহিল। ক্ষণেক পরে ধীর কণ্ঠে কহিল—

—"জানি না আপনি আমার কাছে কি প্রত্যাশা করেন, আর আমি আপনার জন্য কিইবা করতে পারি।

—"ইচ্ছা করলে তুমি সবই করতে পার। যদি কেউ এ বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে—সে তুমি।"

—"আমি!"

—"হাঁ, তুমি।"

—"আমি! আমি!—হাঁ; হয়ত আপনার কথা বুঝেছি। মিছামিছি না বুঝ্বার ভান ক'রে লাভ কি! কিন্তু সে হয় না—অসম্ভব। যা আমার জীবন মরণের কথা তা নিয়ে আমি খেলা করতে পারিনা। আমায় মার্জ্জনা করবেন।

—"কমলা ভেবে দেখ। তুমি বুদ্ধিমতী। ভগবান তোমায় বুদ্ধি দিয়েছেন, পরের দুঃখ বুঝবার অনুভূতি দিয়েছেন—"

—"না যা আমার শক্তির বাইরে তেমন কিছু—"

—"মা, শোন। ভগবান কম শক্তি দিয়ে কাউকে জগতে পাঠান না। তোমার সেই সমস্ত শক্তিকে জাগ্রত কর, উদ্বুদ্ধ কর। দুষ্কৃতির জন্য যে অসাধ্যসাধন করেছো, আজ সেই হাতেই তার সংশোধন, তার প্রায়শ্চিত্ত কর।"

কমলা পুনরায় গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইল। ভাষাহীন চ'ক্ষে অন্যমনস্ক ভাবে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। রাজিব লোচন বাবু পুনরায় আরম্ভ করিলেন।

—"আর ভেবে দেখ আজ যৌবনের আবেশময় চোখে যা সুন্দর যা অনুপম ঠেক্‌ছে—দু'বছর পরে কি তা এমনি ঠেক্‌বে? আজ যাকে বিধাতার করুণা ব'লে মনে হ'চ্ছে,কাল কি একেই তার প্রবল অবিচার ব'লে মনে হবে না? ভেবে দেখ—একদিন এই আজন্ম-সৌভাগ্যে-বর্দ্ধিত এই চপল মতি যুবক—তার রূপ-মোহ, চোখের নেশা কেটে গেলে এই সমস্ত ব্যাপারটাকে সে কি চোখে দেখবে? একদিন সহসা স্বপ্নভঙ্গে এই উচ্ছৃঙ্খল উদ্‌ভ্রান্ত জীবন ধারাকে ক্ষণিকের ভ্রান্তি-মোহ বলে ধিক্কার দিবে না? এই

জীবন ধারাকে জঘন্য, হেয় বোধে দুঃস্বপ্ন ব'লে অস্বীকার করবেনা ? তার ভাগ্য বিধাতাকে—তার এই অভিশপ্ত বিড়ম্বিত জীবনের জন্য অভিযোগ দিবে না ? সে মুহূর্ত্ত কি তোমার পক্ষেই বাঞ্ছনীয়, না তার পক্ষেই কাম্য ?

কমলার নিকট এই অপ্রিয় সত্য ভীষণ, দুঃসহ হইলেও নির্ম্মম হইলেও অখণ্ডনীয় সত্যরূপে প্রতিভাত হইল। বজ্রাহতের কাছে বজ্রাঘাতের মত অমোঘ, মূক, ভাবাহীন, স্তব্ধভাবে সে শুনিতে লাগিল। তাহার বলিবার কিছুই ছিল না।

—"তুমি তার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে পার, আমি একথা না হয় মেনে নিলাম। কিন্তু যার জন্য তুমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করবে সেই ত্যাগের পরিবর্ত্তে সে তোমায় দেবে কি ? তোমাদের মিলন ? যে মিলনে বন্ধন নাই—ধর্ম্ম নাই—সমাজ নাই—আচার নাই—সে কেমন মিলন ? যাতে ভগবানের আশীর্ব্বাদ নাই, আত্মীয় স্বজনের উল্লাস নাই, মানব সাধারণের শ্রদ্ধা নাই ? আর তোমার দিক হ'তে দেখতে গেলে ভেবে দেখ, যখন তুমি দেখ্‌বে—একজন ঐশ্বর্য্যের কোলে বর্দ্ধিত হয়ে সে তার পিতা মাতা, বন্ধু বান্ধব, মর্য্যাদা, আভিজাত্য সব বিসর্জ্জন করবে কার জন্য ? সে কি তার কুল মর্য্যাদা সম্মান বাড়াবে, সে কি লক্ষ্মীস্বরূপিনী কুলবধূ হয়ে তার আধার ঘরে বংশের দেউটি জ্বালবে—"

আকাশের উদ্ধত বজ্র প্রলয় নির্ঘোষে কমলার মাথায় আসিয়া পড়িল। প্রলয়ের কালাগ্নি শতপাকে তাহাকে বেড়িয়া ধরিল—তাহার পথ কোথায় ? তাহার দুরাশা, দুরন্ত লোভের শাস্তি ঘনীভূত হইয়া তাহাকে নাগিনীর সহস্র পাকে বেড়িয়া ধরিল।

—"মা, এখনও সময় আছে। যা হবার তা হয়ে গেছে। কিন্তু যে

দুর্দ্দৈবকে ইচ্ছা কল্লে ঠেকাতে পার তাকে আর অনর্থক ডেকে এনো না।"

কমলা বিষাদঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে আপন মনে কহিল, "আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে।"

—"তাই মা! জীবনে মানুষ অধিকক্ষণ স্বপ্ন দেখেনা। মা কমলা! জাগো—জগতের কাজে লাগো। সম্মুখে যে পথ সে পথ কুসুমাবৃত নয়—সে পথ ক্ষুরধার দুর্গম।

—"এর পর আর আমার বেঁচে লাভ কি? আর এ পোড়া প্রাণে প্রয়োজনই বা কি?

—"কিন্তু মা, মরলেই কি দুঃখের হাত এড়ান যায়। তুমি যাকে একদিন ঘর সংসার আত্মীয় স্বজন, সমাজ সব বন্ধন হতে কেড়ে নিয়েছো তাকে তেমনি অবস্থায় ফেলে পালানটাকি কর্ত্তব্য হবে? তোমার মৃত্যুর পর একবার তার অবস্থার কল্পনা কর দেখি। স্রোতের তৃণের মত সে সংসারে শুধু উদ্দেশ্যহীন বন্ধনহীন ভাবে ভেসে বেড়াবে, সংসার যাকে ধিক্কার লাঞ্ছনা অপবাদ দিয়ে দূরে ঠেলে রাখবে, লোকে যাকে দেখ্‌লে মুখ ফিরিয়ে নেবে, যাকে তুমি একদিন আপন হতে আপনার ভেবেছো, তার এ অবস্থা কল্পনাতেও কি তুমি আন্‌তে পারো? কিন্তু এ শুধু কল্পনা নয়—এ ধ্রুব সত্য। আমার এ রূঢ় অপ্রিয় কথার আলোচনায় আমি নিজেই মর্ম্মাহত। কিন্তু তুমি আমার মনের অবস্থা বুঝে আমার সে অপরাধ নেবে না এই ভরসাতেই আমি অকপট দ্বিধাহীন ভাবে তোমার সম্মুখে এ আলোচনা করতে পারছি। মা কমলা, তুমি ভেবে দেখ আমি কত বিপদগ্রস্ত, আর সে বিপদ হতে যদি কেউ উদ্ধার করতে পারে—সে

তুমি। মা, তুমি যদি এই অকূলে কূল দাও, আমি বলছি—একদিন যিনি সকলের সকল কথার, সকল কাজের হিসাব রাখেন তিনি অবশ্যই তার জমার খাতায় একথা সোণার অক্ষরেই লিখে রাখবেন এবং ফিরিয়ে দেবার বেলায় সুদে আসলেই তিনি তোমায় এ ফিরিয়ে দেবেন।"

কমলা ধীর সংযতকণ্ঠে কহিল—"কি আমায় করতে হবে বলুন; আমি আপনার আদেশের জন্য প্রস্তুত।"

"তোমার তাকে বলতে হবে, তোমার ভাবে ভঙ্গীতে ব্যবহারে বুঝতে দিতে হবে—তুমি তাকে কোন দিন ভাল চোখে দেখনি, এখনও দেখ না।"

"সে তা বিশ্বাস করবে না।"

"তোমায় এ স্থান ত্যাগ করতে হবে।"

"পৃথিবীর শেষ সীমা পর্য্যন্ত ও সে আমার অনুসরণ করবে।"

"তবে উপায়—?"

কমলা অবনত মুখে ক্ষণিক নীরব থাকিয়া সহজ কণ্ঠে কহিল,

"উপায় আছে।"

"আমার ভয় হয় পাছে—"

"ভয়? ভয়ের কোনই হেতু নাই।"

"তা হ'লে তার কাছে এ কথা গোপন রাখতে হবে তো—"

"আপনি আমায় সম্পূর্ণ জানেন না তাই এত দ্বিধা ও ভয় করছেন। যে কথা আপনাকে দিলাম, আমি বেঁচে থাকতে তৃতীয় ব্যক্তি তা জানতে পারবে না।"

"আমি তোমার ব্যবহারে, তোমার কথায় এক অভিনব বিস্ময়-পুলকে অভিভূত হচ্ছি। এর কোন প্রতিদান দেই আমার তা সাধ্য নাই। তবুও যদি আমি তোমায় কোন বিষয় কিছু সাহায্য করতে পারি—"

"আমায় সাহায্য! না। হাঁ, শুধু একটি ভিক্ষা। দয়াকরে আমার সেই প্রার্থনাটুকু পূরণ করলেই যথেষ্ট অনুগৃহীতা হ'ব। যেদিন সমস্ত সংসার আমার এই ব্যবহারকে কলুষ-পরুষ ভেবে সহস্র কণ্ঠে ধিক্কার দিবে, যেদিন আমার এই দুস্তর দুঃখ বেদনাকে সকলে কলঙ্কিনীর সহজ ও সাধারণ প্রতারণা ভাব্‌বে, যেদিন আমার কথা মুখে আনতে সবাই ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে—আমি ততদিন জীবিত না থাকলে সেইদিন তাকে বলবেন—আমি সত্যি সত্যি ততদূর ঘৃণ্য নই। আমি সত্যি—তার কাছে বিশ্বাস-হন্ত্রী নই—কর্ত্তব্যানুরোধে বিশ্বাস-হন্ত্রীর অভিনয় করেছি মাত্র।" কমলার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। অশ্রু দমন করিয়া সহজ কণ্ঠে সে কহিল—

"আপনার বোধ হয় এখানে আর অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। এই মুহূর্ত্তেই সে এখানে আস্‌তে পারে। তা হ'লে সমস্তই বিফল হবে।"

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ক্ষণেকের জন্য কমলার অপূর্ব্ব-ভাব-মণ্ডিত সংযমক্লিষ্ট মুখের দিকে বিহ্বলের মত চাহিয়া রহিল। যেন কোন অমানুষী শক্তি বলে সে তার দেহের মধ্যে তাহার প্রাণকে কবর দিতেছিল।

"মা আজ আমি কি বলে তোমায় আশীর্ব্বাদ ক'র্ব্বো বুঝতে পারছি না। মা, আমি বৃদ্ধ, আমি ব্রাহ্মণ—তুমি আমায় অপ্রত্যাশিতরূপে এমন কিছু দান করলে যা আমি কোনও দিন কল্পনাতেও আনি নি।

এতখানি দান এতখানি ত্যাগ বৃথায় যাবে না। মা, ভগবান তোমার ভাল করবেন।"

(২)

রাজীবলোচন বাবু চলিয়া গেলে কমলা কক্ষতলে লুটাইয়া পড়িল। কমলা এতক্ষণ যেন প্রাণপণ বলে তাহার চেতনাকে সজাগ রাখিয়াছিল, এইবার আর তাহার ধৈর্য্যের বাঁধ মানিল না। সংজ্ঞাহীনার ন্যায় কক্ষতলে লুটাইয়া পড়িয়া সে কাঁদিতে লাগিল। জীবনের যে সুধা-পাত্রটি কানায় কানায় ভরিয়া তাহার ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়াছিল, কোন অদৃশ্য হস্ত তাহার নিষ্ঠুর নির্ম্মম আঘাতে যেন তাহার চোখের সামনে তাহা আছড়াইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া গেল, কমলার আর যেন জাগতিক কোন বিষয়ে কোন প্রয়োজন, কোন উৎসাহ, রহিল না। কিন্তু অলস নিশ্চেষ্টতায় বসিয়া থাকিবারই বা অবসর কোথায়? কমলার বুকের ভিতর সহস্র অতৃপ্ত কামনা বিদ্রোহের সহস্র ফণা তুলিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল। আবার তাহারই বুকের ভিতর হইতে যেন কাহার অলঙ্ঘ্য আদেশ অঙ্গুলি সঙ্কেতে তাহার সমস্ত ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ প্রবৃত্তিকে শান্ত সংযত হইবার ইঙ্গিত করিতেছিল।

কমলা কম্পান্বিত কলেবরে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। আর যে অপেক্ষার সময় নাই। হয়ত সুরেশ এখনই আসিয়া পড়িবে। মুহূর্ত্তের বিলম্বে, নিমেষের শৈথিল্যে যে সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে।

কমলা উঠিয়া গিয়া একখানা চেয়ারে অবসন্ন ভাবে বসিয়া পড়িল। মোহময় অতীতের কত কথা মনে পড়িতে লাগিল। আসন্ন বিপদসঙ্কুল ভবিষ্যতের ভীষণতা তাহার চোখের সাম্‌নে নানা বিভীষিকায় পরিস্ফুট

হইয়া উঠিল। সে বুঝিতে পারিল সুরেশের সম্মুখে মুখোমুখী দাঁড়াইয়া এতবড় অমানুষী বিশ্বাসহন্ত্রীর কাজ তাহার দ্বারা সম্ভব হইবে না। পুনরায় সে অবসন্ন ভাবে টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া পড়িয়া রহিল।

টেবিলের উপর কালী,কলম, কাগজ লিখিবার সমস্ত উপকরণই সজ্জিত ছিল। নিরুপায় হইয়া অবশেষে সেই সুযোগ সে গ্রহণ করিল।

কতবার কাগজের উপর সে আঁচড় কাটিল তাহা অর্থহীন অস্পষ্ট হইয়া গেল। কতবার লিখিতে যাইয়া চোথ ঝাপ্সা হইয়া আসিল ; আবার চোথ মুছিয়া সে লিখিতে আরম্ভ করিল। যে নিদারুণ অপরুষ কথা তাহাকে ভাষায় প্রকাশ করিতে হইবে, লেখনী মুখে যেন তাহা বাঁধিয়া যাইতে লাগিল। তাহার প্রত্যেকটি কথা তাহার হৃদয়ের বিন্দু বিন্দু রক্ত যেন শুষিয়া ফেলিতেছিল, হৃদপিণ্ডকে যেন পিষিয়া ফেলিতেছিল। নিজের মৃত্যুদণ্ড হয়ত কাহাকেও এ পর্য্যন্ত নিজের হাতে লিখিতে হয় নাই কিন্তু সেই মৃত্যুদণ্ডের চেয়েও নির্দ্দয় অকরুণ দণ্ড যেন তাহারাই পাষাণ হস্তের অপেক্ষা করিতেছিল।

যাতনা-বিহ্বল চিত্তকে যথাসাধ্য দমন করিয়া সে প্রস্তুত হইল। তাহার মনের মধ্যে অসংযত পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবগুলিকে সে গুছাইয়া ভাষায় যেন পরিস্ফুট করিতে পারিতেছিল না। তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে যেন সমস্ত চিন্তাগুলি বিশৃঙ্খল ভাবে ভীড় করিতেছিল। সেই অবস্থাতেই সে লিখিতে লাগিল।

"প্রিয়তম, প্রাণাধিক, আমার অপরাধ নিয়ো না। আমার মার্জ্জনা কর। আমি উপায়হীনা। তোমায় পাইয়া আমার সাধ মিটিল না। আমি তোমায় প্রাণ ভরিয়া পাইলাম না। এ সংসারে কাহারও সুখ

দুঃখ কেহ বুঝে না, চাহিয়া দেখে না। তাই দুর্ব্বল নিরুপায়কে সবল টুঁটি চাপিয়া পিষিয়া মারে। এই পৃথিবীতে জন্ম লইয়া একমাত্র তোমাকে পাইয়া পৃথিবীর সমস্ত সুখ-শান্তি যেন হাতের মুঠির মধ্যে পাইয়াছিলাম। কিন্তু মানুষের সৃষ্ট শৃঙ্খলিত নিয়ম, অনুশাসন,—অনধিকার বোধে আমার হাত হইতে তোমাকে জোর করিয়া কাড়িয়া লইল। আজ আমার প্রাণে যে বেদনা বাজিতেছে একদিন হয়ত এই দেহ ছাড়িয়া যাইতেও তেমন যন্ত্রনা বোধ হইবে না। কি করিব আমি উপায়হীনা—আমার কোন অধিকার নাই, কোন দাবী নাই—"

কমলা তাহার সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া দিয়া লিখিতেছিল। লিখিতে লিখিতে হঠাৎ সে চমকিতা হইল। এ কি সে লিখিতেছে! আত্মহারা তাহার মর্ম্মের গোপনতম কথা তাহার বন্ধনহীন লেখনীর মুখে আজ এ কি ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেছে! লুপ্ত-চেতনা ফিরিয়া পাইয়া কমলা লেখনী সংযত করিল। সে জাগিয়া জাগিয়া কোন্ মোহস্বপ্নে বিভোর হইয়াছিল? হায়রে, অপদার্থ নারীর মন! লেখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সে আবার নূতন করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিল।

তাহার হাত কাঁপিয়া উঠিল। সমস্ত শরীরময় এক চঞ্চল শোনিত-প্রবাহ বহিয়া গেল। নিভিবার পূর্ব্বে দীপ যেমন করিয়া শেষ বারের মত তীব্র শিখায় জ্বলিয়া উঠে, কমলা তেমনি প্রাণপণে তাহার সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া লেখনী-মুখে চালিত করিল।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

অশেষ বিনতিপূর্ব্বক এ অধিনীর নিবেদন এই যে, সুরেশ বাবু, আজ কর্ত্তব্যবোধে আপনার নিকট একটি লজ্জাকর অপ্রিয় সত্য করিতে বাধ্য হইতেছি—ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ আপনার ন্যায় সরল অকপট ব্যক্তির সহিতও আমাকে এতদিন ধরিয়া মি প্রতারণা করিতে হইয়াছে। দৈবাধীন কোন ঘটনাক্রমে সে কথা ... আপনার নিকট প্রকাশ না করিয়া উপায় নেই। এতদিনে আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে আমার এই ব্যবহার অত্যন্ত অন্যায় অসঙ্গত হইয়াছে এবং সে কারণে আমি বাস্তবিকই দুঃখিত এবং অনুতপ্তা! কিন্তু অবস্থাধীনে আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। ছল, চাতুরী, প্রতারণা ইহাই একমাত্র আমাদের জীবিকার উপায় এবং অবলম্বন!—ইহা ভিন্ন আমাদের সম্মুখে দ্বিতীয় পন্থা নাই। আমি কিছুদিন হত হইতেই একথা আপনাকে জানাইব বলিয়া মনে করিতেছিলাম, সঙ্কোচ ও চক্ষুলজ্জায় তাহা পারি নাই। কিন্তু এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে পূর্ব্ব অনবধানতায় কাজ ভাল করি নাই। যাহা হউক আমি যে এই বৈচিত্র্যহীন নিঃসঙ্গ একঘেয়ে জীবনধারায় বিশেষরূপে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি তাহা আমি আজ স্পষ্টই স্বীকার করিতেছি। আমার চিরাভ্যস্ত জীবনপথই আমার পক্ষে প্রশস্ত বলিয়া মনে করি। যতদিন আপনার অধীনে ছিলাম ততদিন সর্ব্বতোভাবে আপনার মন রাখিয়াই চলিয়াছি, আবার হয়ত যাহার অধীনে থাকিব তাহার মন রাখিয়াই চলিতে হইবে। আমাদের নিজের কোনও সাধ আকাঙ্ক্ষা থাকিতে নাই। স্রোতের শেওলা এইভাবে চির দিনই স্রোতের সঙ্গেই চলিতে হইবে। বাসি ফুল শুকাইয়া গেলে লোকে

আবর্জ্জনার মধ্যেই পরিত্যাগ করিবে। এতে দুঃখিত বা আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই—এই আমাদের জীবন। আর জীবনকে আমরাও এই ভাবেই গ্রহণ করিয়া থাকি। সংসার আমাদের কাছে পণ্যশালা—কেনা বেচা, লাভ লোকসানের ব্যাপারে যে অধিক মূল্য দেয় তাহারই পায়ে আমরা জীবন বিকাইয়া দেই। পুনশ্চ লিখি দুইদিনের মোহভ্রান্তি দিয়া অনর্থক যে আপনাকে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী করিয়াছিলাম এ জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিতা। আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। এক্ষণে যাহাতে আপনার সহিত আমার আর কোনরূপ সাক্ষাৎ না হয় তাহা উভয়তঃই কর্ত্তব্য এবং সঙ্গত। আজ হইতে পুনরায় আমার গৃহে পূর্ব্বের ন্যায় পূর্ব্ব পরিচিত সঙ্গী সাথীদের সমাগম হইবে; সুতরাং আমার সহিত আপনার সাক্ষাতের আর কোন প্রয়োজন বোধ করি না। এবং আমি যতদূর আপনাকে জানি তাহাতে আশা করি যে আপনিও সেরূপ অসঙ্গত চেষ্টা হইতে বিরত থাকিবেন। ইতি—

চরণাশ্রয়চ্যুতা—কমলা

পত্রখানা লেখা শেষ করিয়া নাম স্বাক্ষর করিবার পর কমলা অর্দ্ধ-স্বগত ভাবে পত্রখানা পাঠ করিতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে তাহার হস্তপদ শিথিল হইয়া আসিল, পত্রের লিখিত অক্ষরগুলি তাহার চোখের সম্মুখে এক অর্থহীন দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকার মত অনুভূত হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে টেবিলের উপর মাথা এলাইয়া দিয়া সে মৃতের ন্যায় পড়িয়া রহিল। কোন কিছু ভাবিবার, বুঝিবার, চিন্তা করিবার সমস্ত শক্তি যেন তাহার দেহ হইতে লোপ পাইল।

(৩)

সুরেশ চুপি চুপি পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেই কমলা তাহার সদ্য লেখা চিঠিখানা ক্ষিপ্র হস্তে সরাইরা ফেলিল। এই পায়ের শব্দ, যত অস্পষ্টই হউক না কেন ইহা যে তাহার বড় পরিচিত। অন্ধ তাহার দৃষ্টির অভাব যেমন করিয়া শব্দ ও স্পর্শ দ্বারা পূরণ করে, চক্ষু বুজিয়াও কমলা যেন একটি সাধারণের অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় দিয়া সুরেশের সান্নিধ্য অনুভব করিতে পারিত।

সুরেশ কক্ষে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ কমলাকে এইরূপ আড়ষ্টভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইল। প্রভাত সূর্য্যকিরণের দিকে পুষ্প কোরক যেমন উন্মুখ আগ্রহে তাহাদের নব কিশলয়গুলি মেলিয়া ধরে, সুরেশের আগমনে তেমনি কমলা তাহার হৃদ্‌শতদলের পাপড়িগুলি মেলিয়া ধরিত। কিন্তু আজ তাহার মুমূর্ষু হৃদয় কোন সাড়াই দিল না। কমলা কাগজখানা তড়িৎবেগে সরাইয়া ফেলিলেও সুরেশের চক্ষু এড়াইতে পারিল না। সুরেশ হাসিয়া কহিল "এত গভীর অভিনিবেশ সহকারে কি-লেখা হচ্ছে দেখি।" কমলা কোনওরূপ উৎসাহ না দেখাইয়া তেমনি নির্জ্জীবের মত পড়িয়া রহিল। মুখে সংক্ষেপে কহিল, "ও কিছু নয়।" সুরেশ কিছুই অনুমান করিতে পারিল না। হঠাৎ কমলার মুখের দিকে চাহিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। কমলার মুখখানা কৃষ্ণপক্ষের রজনীর ন্যায় গভীর কালিমায় আচ্ছন্ন। সুরেশ চিন্তাযুক্ত ভাবে মিনতিভরা কণ্ঠে কহিল "কাকে তুমি কি লিখছিলে কমলা!" কমলা উদাসীন ভাবে ভারী গলায় কহিল "বলেছি ত ও বিশেষ কিছু নয়" সুরেশ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল "কমলা আমর বিশ্বাস, আমাদের দুজনার মধ্যে লুকোচুরি, বোঝা পড়া—

এ সব অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে। হয় নি কি ? তোমার আমার মাঝে ত' আর কোন রহস্যের আবরণ, কোন গোপনতার কুয়াশা আচ্ছন্ন করে নাই। আমরা যে প্রচণ্ড প্রখর সূর্য্যালোকে দিবা দ্বিপ্রহরে দুজন দুজনকে চিনে নিয়েছি. কমলা মাথা না তুলিয়া তেমনি অবসন্ন কণ্ঠে কহিল,"আর সন্দেহের সংশয় অবিশ্বাসের পালাও শেষ করেছি বোধ হয়,"—সুরেশের মুখখানি দারুণ লজ্জায় মলিন হইয়া গেল। সে সঙ্কোচের সহিত কহিল, "আমায় মাপ কর। এইমাত্র আমি কি অবীব উত্তেজনাময় অশান্ত হৃদয় নিয়ে তোমার কাছে ছুটে এসেছি তা তুমি জাননা। আরও আশ্চর্য্যান্বিত হচ্ছি এইজন্য যে আমার হৃদযে যে তুমুল ঝড় এখন বইছে তারই সুস্পষ্ট ছাপ যেন তোমার মুখে দেখতে পাচ্ছি," সুরেশ খানিক থামিয়া কোমল কণ্ঠে কহিল "কমলা আজ ভোরে আমাব মামা এসে পৌছিযেছেন।"

"তোমার মামা ? যিনি এখন তোমার অভিভাবক। তোমার বাবা মরবার পব যিনি তোমাব সংসাব দেখ্‌ছেন ?"

—"হাঁ তিনি।"

"তাব ত খুব নাম শুনছি, তোমাদেব এত বড় বিস্তীর্ণ জমিদারী একাই শাসন সংরক্ষণ কচ্ছেন। তোমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে ?"

—"না, আমি আজ ভোরে বেরিয়ে গিয়েছিলুম, বাগানে এসে খবর শুনলুম তিনিও এসে কি একটা জরুরী কাজে বেরিয়ে গেছেন, তাই দেখা হয় নাই। কিন্তু বাসায় বলে গেছেন যে সকালেই ফিরবেন, আমি যেন তার অপেক্ষা কবি। তাই অশান্ত হৃদয় নিয়ে তোমার কাছে ছুটে এসেছি। কমলা এখন বল আমি কি করি ?--

"যা সহজ তাই কর, আমার সংশ্রব ত্যাগ কর।"—সুরেশ কাতরকণ্ঠে ডাকিল, "কমলা!" কমলা ক্ষীণ অস্পষ্ট কণ্ঠে কি যেন কহিতে চাহিল, কিন্তু কণ্ঠরোধ হওয়ায় তাহা বলিতে পারিল না। তাহার চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল, অশ্রু গোপন করিবার জন্য অন্য দিকে সে মুখ ফিরাইল! এবারেও কমলা সুরেশের চক্ষু এড়াইতে পারিল না। সুরেশ চিন্তান্বিত ভাবে কহিল, "কমলা আমি ঠিক ধরতে না পারলেও বুঝ্‌তে পারছি— তুমি আমার কাছ থেকে কিছু গোপন কচ্ছ। আমি লক্ষ্য করছি কথার মাঝে তোমার চোখ মুখ অস্বাভাবিক ভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে,কথা বল্‌তে গিয়ে তোমার কণ্ঠ বাষ্পাকুল রুদ্ধ হ'য়ে এসেছে।" কমলার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। সুরেশ কহিল, "কমলা তোমায় মিনতি করছি, আমায় একবার সেই চিঠিখানা দেখতে দাও।" সুরেশ চিঠিখানা লইবার জন্য হাত বাড়াইল! কমলা তাহাকে বাধা দিয়া কহিল, "ও খুলোনা। ওতে এমন কিছুই নাই যা তোমার না দেখলেই নয়!" সুরেশ মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, "যদি পড়তে নাই দাও, তাহ'লে তুমি আমায় মুখে বল যে কি ওতে আছে।" কমলার কণ্ঠ এইবার অনেকটা কোমল হইয়া আসিল, "আজ নয় আর একদিন বলিব।" হঠাৎ কমলা মুখ তুলিয়া ঘড়ির দিকে চাহিয়া কহিল, "এতক্ষণ হয়ত তোমার মামা অপেক্ষা করছেন, তাহলে এইবার এস।" সুরেশ বিস্মিত হইয়া হাসিয়া কহিল, "আজ এত তাড়া"— কমলা লজ্জিতা হইয়া তাড়াতাড়ি নিজকে সামলাইয়া লইয়া কহিল "না, না তার মানে আজকের মত—আর হয়ত তোমার মামা তোমার জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা কচ্ছেন।" সুরেশ কহিল "হাঁ যাচ্ছি।"—সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইতেই কমলা ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল, আর একটু

বস। পুঞ্জীভূত মুক বেদনা রাশি সহস্র ধারায় তাহার হৃদয় তটে রুদ্ধ আবেগে আজ বহিয়া পড়িতে লাগিল,প্রকাশের ভাষা পাইল না। তাহার হৃদয়ের বেদনারাশি সহস্রকণ্ঠে অশ্রুবন্যাপ্রবাহে আর্ত্তনাদ করিতে যাইয়া রুদ্ধ আবেগে ফিরিয়া আসিল। কমলা সুরেশের স্কন্ধের উপর মাথা রাখিয়া অভিমান ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল, "এত তাড়া— মুহূর্ত্তের বিলম্ব আর সইছে না।" . সুরেশ হাসিল। বিদায়কালীন মান অভিমানের চিরন্তন হাসি ছল ভরা সহস্র কথা কাটাকাটি আজ নূতন নয়, তবুও তাহার কাছে কমলার এই অস্বাভাবিক অস্থিরতা যেন কেমন নূতন ঠেকিল। কমলা সাহসা আবেগ জড়িত কণ্ঠে কহিল, "আচ্ছা তুমিই বল যে কদিন দুজন একসঙ্গে কাটালেম, কারও পক্ষে বোধ হয় অনুতাপ করবার মত কিছু ঘটে নি। ঘটেছে কি? যদি কোন দিন ভুলে, অজ্ঞানে মোহে কোন ত্রুটি করে ফেলি, তোমার মনে কষ্ট দেই সেদিন নিশ্চয়ই আমায় ক্ষমা করবে। করবে না? তখন ভেবে দেখো আমি বড় নিরুপায়, আমি বড় দুঃখী। আর সেইদিন আমার জীবনের ছোট খাট ভালবাসার নিদর্শন গুলির কথা মনে করে আমার ত্রুটী মাপ করো, সেদিন যেন আমার উপর ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আমায় অভিসম্পাৎ দিওনা। আজ তোমার মনে, আমার উপর যে বিশ্বাস, যে মায়া মমতা আছে এই কথা মনে করে সেদিন আমায় ক্ষমা করো।—মনে করো একদিন আমি সত্যই ভালবেসেছিলাম।" সুরেশ কমলার এই অপূর্ব্ব কথায় অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইল। কমলার এই আবেগজড়িত কণ্ঠ, তাহার এই অপূর্ব্ব ভাষা, এই অপূর্ব্ব ভঙ্গিমা ইহার অর্থ যদিও সে বুঝিতে পারিল না, তাহার মনে এই সব কথাগুলি বারবার তোলপাড় করিতে লাগিল: সুরেশ অনেক-

ক্ষণ কমলার মুখের দিকে বিস্ময়াবিষ্ট নয়নে চহিয়া রহিল। "এসব কি কথা কমলা ?"—"যে কথা ভাষায় প্রকাশ হয় না, তোমার উপর সেই অনন্ত বিশ্বাস,অনন্ত নির্ভরতার কথা প্রিয়তম"—"তবে চোখে জল কেন ?" "অবোধ চোখের জল বারণ মানে না ; ও এখনি থেমে যাবে। তোমার কাছে রয়েছি, তোমায় দেখেছি এ যে কি মোহ, এ যে কি লোভ ! আমি মূঢ়া কি জানি কেন শুধুই চোখে জল আসে। এই নাও মুছে ফেল্লাম, আর নাই। এইবার কাছে এস—আরও কাছে। কমলার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, বাস্পাকুল কণ্ঠে কহিল, "আমি বড় দুঃখী, আমি বড় নিরুপায় আমায় ক্ষমা কর। এই দেখ আমিও হাস্‌তে পারি।" সুরেশ বিস্ময়মুগ্ধ নেত্রে অপলক আঁখিতে সে মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

অন্ধকার কক্ষে কমলা আর প্রদীপ জ্বালিল না। নিবিড় নিস্তব্ধতার মাঝে সে নিজকে উপলব্ধি করিতে লাগিল। তাহার বুকের ভিতর যেন বিকট নিঃশব্দতার বেদনা গুমরিয়া উঠিতে লাগিল। রাশি রাশি, পুঞ্জীভূত নিরাশায় যেন তাহার হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল। তাহার চিত্ত ভরিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার উপর, তাহার জন্মের উপর, তাহার নিস্ফল জীবন ধারণ, অস্তিত্বের উপর, ধিকার জন্মিতে লাগিল। যদি তাহার পূজার অধিকার নাই, তবে এ অর্ঘ, এ নৈবেদ্য, এ পঞ্চ প্রদীপ জ্বালাইবার এ দুর্ণীবার আকাঙ্ক্ষা তাহার প্রাণে কেন জাগিয়াছিল। এত আত্মদান নয়, তাহার আত্মহত্যা। এ যে তাহার মরণাধিক মরণ। কতবার তাহার মনে হইল—নিজ ইচ্ছায় নিজের পায়ে সে কেন বেড়ী জড়াইবে; নিজের পায়ে এমন করিয়া কেন সে কুঁড়াল মারিবে। নিজের হৃদ্‌পিণ্ড এমন

করিয়া সে কেন উপড়াইয়া ফেলিবে? কিসের জন্য! নীতি, সমাজ! যাহা চিরদিন শুধুই তাহাকে ঘৃণাভরে দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছে! পরিবর্ত্তে সে কি পাইবে! —পুণ্য? তাহা সে চায় না। তাহাতে তাহার কোন লোভ নাই। তাহার বুকের মধ্যে অসহনীয় যন্ত্রণা শানিত ছুরির মত তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। বড় যন্ত্রণাতেও তাহার হাসি পাইল। একদিন এই সমাজের অবিচারের উপর প্রতিশোধ দিবার জন্যই না সে স্বেচ্ছাতন্ত্রী স্বৈরিনীর বেশে বাহির হইয়াছিল! আশ্চর্য্য এই বিশ্বনিয়ন্তার রচনা কৌশল!

কিঞ্চিৎ আত্মস্থা হইয়া কমলা তাহার ঝিকে ডাকিল। সে উপস্থিত হইলে কতকগুলি চিঠি তাহার হাতে দিয়া কমলা কহিল "এই চিঠি খানা নিয়ে যা। দরোয়ানকে বল—অমর বাবু, সিধু বাবু, সত্যেন্ বাবু তাদের এই চিঠিগুলো দিতে। আর,—আর বলে আসে, আজ রাতে এখানে—এখানে, নাচের মজলিসে তাদের নিমন্ত্রণ। আর—" বলিতে বলিতে অর্দ্ধ সমাপ্ত কথা তাহার মুখে আট্‌কাইয়া গেল, তাহার মুখ বিবর্ণ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। আত্মসংবরণ করিযা সে কহিল "এই খানা সুরেশ বাবুকে দিয়ে আসে।"

—"কিছু কি বলতে হবে?"

—"না।"

—"তোমায় যে আজ কেমন শুক্‌নো দেখাচ্ছে। তোমার কি কোন অসুখ করেছে মা?

—"না। তুই এখন যা। আমি এখন একটু ঘুমুব। আর দেখ আমি নিজে না জাগলে কেউ যেন আমায় না জাগায়।"

বিধুঝি সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়িয়া প্রস্থান করিল।

রুদ্ধদ্বার কক্ষে অসার নিস্পন্দদেহে কমলা মেজের উপর লুটাইয়া পড়িল। তাহার চেয়ে যদি এই নির্জ্জন কক্ষে, লোকলোচনের অন্তরালে, শত কুৎসিৎ কুতুহলী দৃষ্টির অলক্ষ্যে, যদি তাহার এই দেহপিঞ্জরের মায়া কাটাইয়া প্রাণ পাখী উড়িয়া যায়,—তাহা হইলে? সেই তো বেশ হয় ক্ষতি কি? কিন্তু তাহা হইলে সুরেশ কি ভাবিবে? উঃ তাহার মৃত্যুর পর জনরবে, সহস্র কণ্ঠে প্রকাশিত, মর্ম্মান্তিক নিষ্ঠুর ক্রুর অপবাদ—সুরেশের অবিশ্বাসের দৃষ্টি সে যে তাহাকে মৃত্যুর পরপার পর্য্যন্তও বিদ্ধ করিবে। এতক্ষণ হয়ত চিঠি খানা সুরেশের হাতে পৌছিয়াছে। সে কি ভাবিতেছে? চিঠিখানা কুঁচি কুঁচি করিয়া ছিড়িয়া পায়ে দলিত করিয়া নর্দ্দমার পূতিগন্ধময় পচা ন্যাকারের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে। আচ্ছা এখনও তো দরোয়ান কোন কারণে সেখানে নাও পৌছাইয়া থাকিতে পারে। আর—আর সুরেশও যে বাড়ীতেই থাকিবে তাহারই বা নিশ্চয়তা কি! কাহাকেও পাঠাইলে হয় না—চিঠিখানা সেই অবস্থায়ই ফিরাইয়া আনে? তাহা হইলেই ত সব চুকিয়া যায়।

কমলা ক্ষিপ্রবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল। চীৎকার করিয়া ডাকিল "বিধু, বিধু—দরোয়ান।"—কোনও উত্তর নাই! ছিছি! কি লজ্জা, কি ঘৃণা!

অবসাদগ্রস্ত ভাবে কমলা আবার মেজোয় লুটাইয়া পড়িল। দোদুল্যমাণ চিত্তে বিভিন্ন ভাবরাশি তাহাকে সবলে দোলা দিতে লাগিল। এক সীমাহীন আদি-অন্তহীন মসীময় কৃষ্ণ যবনিকা তাহার ভবিষ্যৎকে যেন আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল। সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে এক মহাশূন্য

বিরাট অন্ধকার! কমলার মন, ক্রমে অবশ অসাড় নিথর হইয়া আসিতে লাগিল।

এমন সময় সহসা একসঙ্গে বহুলোকের উচ্ছৃঙ্খল সুরামত্ত কলরব তাহার মনকে ঠোকর মারিয়া যেন বাস্তব রাজ্যে ফিরাইয়া আনিল। সেই মত্ত মধুপদলের মধ্য হইতে কেহ গুন্ গুন্ স্বরে সুরের রেশ লাগাইয়া গুঞ্জন্ করিতেছিল "হেসে নাও দুদিন বৈত নয়।" কেহ বা জড়িত কণ্ঠে গাহিতেছিল, "তুমি যে হে প্রাণের বঁধু, আমরা তোমায় ভালবাসি।" কেহ বলিতেছিল "এযে কঠিন নিগড়, নিগূঢ় মধুর, চিরবাঞ্ছিত কারা।"

ঘৃণায়, ক্ষোভে কমলার মন তিক্ত বিস্বাদ বিষময় হইয়া উঠি । এই ত তাহার জীবন! তাহার চিত্ত বিদ্রোহ করিলেও, মন মূর্চ্ছিত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেও, আত্মা পীড়িত লাঞ্ছিত হইলেও ইহাকেই তা মাথা পাতিয়া বরণ করিয়া লইতে হইবে। তাহার স্রষ্টা এই জন্যই ত তাহাকে পৃথিবীর কোলে জন্ম দিয়াছেন। তাহার অন্য পথ নাই। তৃণগুচ্ছের মত সে স্রোতে ভাসিয়া চলিবে। মাঝে মাঝে উচ্ছ্বাসময় ফেনিল তরঙ্গে নাচিবে, আবর্ত্তে দুলিবে আবার একটানা ভাসিয়া চলিবে। তাহার কোন বাঁধা নাই, বন্ধন নাই! কোন বিধি নাই, নিষেধ নাই তাহার জন্য পাপ পুণ্যও বুঝি নাই। এই যে মুখের হাসি চোখের জল হয়ত তার কোনও অর্থ নাই! তাহার সুখ দুঃখ হয়ত শুধু ভাণ! তাহার দেহ হাটে পণ্যের মত বিকায়। তাহার রূপ শত কামুকের বাসনার ইন্ধন যোগাইবার জন্য! তাহার যৌবন লম্পটের প্রবৃত্তিচরিতার্থের জন্য! তাহা ছাড়া তাহার অপর কোন অর্থ নাই! নাই কি? না, না। সেই মমতাহীন, হিম-শীতল, কঠিন, পাষাণময় মারবেলপাথরের

মেজের উপর সে বার বার মাথা ঠুকিতে লাগিল—আঘাতে বেদনা বোধ পর্য্যন্তও যেন তাহার নাই। উৎসব সজ্জায় সজ্জিত হলঘরে কোলাহল ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। ফাঁসীর আসামী যেমন তাহার অসাড় দেহে শৃঙ্খলের পীড়ন অতি অল্পই অনুভব করে তেমনি কমলা তাহার বোধহীন শরীরকে কোনমতে টানিয়া তুলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। তারপর এ পৃথিবীতে তাহার চরম দণ্ড সে মাথা পাতিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বহুজনের প্রতীক্ষমান বহু পিপাসিত বুভুক্ষিত দৃষ্টির জন্য প্রস্তুত হইয়া হলঘরের দিকে স্থির পদে অগ্রসর হইল।

কমলার একমাত্র প্রিয়সখি ললিতা-সুন্দরী বহুদিন পর হঠাৎ কমলার নিকট হইতে পত্র পাইয়া তাড়াতাড়ি খুলিল। "ওলো আমার হেনাবুই, সইলো খবর চমৎকার! বহুৎ রোজ পর আজ আবার তোর দরবারে আরজি পেষ করছি, গোস্তাকি মাফ হয়! তুই কিনা আমার কানাকড়ি, বুদ্ধির ঘড়া। এদিকে আমার নিজের ঘড়া যে উজাড়, তাই তোর কাছে ধার চাইতে এসেছি।

ওলো শোন্ 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল, অমিয় সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল!!' একদিন এক নিশ্বাসে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে যখন বেরিয়ে পড়েছিলাম সে দিন তুই হেসেছিলি। সে হাসির অর্থ সে দিন বুঝি নি, আজ বুঝতে পেরেছি।

ওলো আমার প্রাণের হেনাবুই! আমার দোকান পাট সব ভেঙ্গে গেছে। রূপের বেসাতি করতে গিয়ে সামান্য সম্বল নিয়ে কারবার খুলেছিলাম, কয়দিনেই তা উজাড় হয়ে দেউলিয়া হয়ে গেলাম।

সব কথা খুলে বলি শোন্। বাপ তাকে ত্যাজ্য পুত্র করবে বলে ভয়

দেখিয়েও দমাতে পারেনি, সে বাপ ত গতাসু হয়েছে। এদিকে মা বেটী ঢং করে তার ছেলের প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে পাঠিয়েছে। মাগীর রকম দেখ না। আবার এদিকে লোভ দেখিয়েছে টাকা যা চাই তাই পাবো। কিন্তু তার পুত্রকে ছাড়তে হবে। আলো আমরা কি শাস্তরে লেখা সেই রক্তশোষা? রাক্ষসী নাকি লা? যাক এইবার পায়ের জিঞ্জিরা কেটে পাখী উড়িয়ে দিলাম। খাঁচায় পুরে ধরে বেঁধে রেখে লাভ কি ভাই? মাইরি কি বরাত জোর! একদিন যা পায়ে ঠেললাম তা আবার পায়ে হেঁটে দুয়ার গোড়ায় হাজির। টাকা কড়ি বহুত লভ্য। এ সুযোগ ছাড়ে কে? কেউ কি তা পারে? কি বলিস? তুই হয়ত জানতে চাইছিস্ সে বিদগ্ধ নাগর কি বলে? আলো তাকে কি আর কিছু জানতে দিই। তাহলে ত সব ভেঙ্গে যায়। এমন পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে লাভ কি?

তার বুড়ো মামা এসেছিল এই কথা নিয়ে। প্রথম দিন ত বিধুঝি ঝাঁটা দেখিয়ে বিদায় করেছিল। বুড়ো কিন্তু নাছোড় বান্দা। ভেবে দেখবার জন্য আবার সাতদিন সময় ও দিয়েছিল, কাল তার সঙ্গে শেষ রফা করে ফেলেছি।

ওলো পুরুষ জাতটা ত শুধুই নারীর শীকার। কটাক্ষ বাণে যত মৃগয়া করতে পারি সেইত নারীর সুখ, আর কি?

তাই বলি পরোয়া কিসের লা? এক দোর বন্ধ, শতেক দোর খোলা। আমরা ভাই সুখের পায়রা, যেখানে সুখ পাবো সেথ দিকেই ছুটবো— কি বলিস? সে কথা যাক ভাই, বলতে পারিস্ এ রোগের ঔষধ কি? সইরে অন্তিমে দেখা দিস্, দেখা দিস্। গোটা কয়েক কথা তোকে বলে যাবো। সইরে—না ভাসায়ো এহি অঙ্গ, না ভাসায়ো জলে। আমায়

বেঁধে রেখে দিও, বটবিরিক্ষি ডালে!! সখিরে, তোরই আশায় সখি। মাইরি বলছি, তুই যেন ফাঁকি দিস্ না। এই চরমকালে তোর দেখা একবার চাই-ই চাই। ইতি—

তোরই কাণাকড়ি।—কম্‌লি।

কমলার হেনায়ই ললিতাসুন্দরী বহুদিন পর তার প্রাণ-প্রিয় সৈয়ের এই হাসি-রহস্যের আবরণে লুক্কায়িত রুদ্ধ বিপুল অশ্রুময় কথা কয়টি পড়িয়া অবস্থা অনেকটা অনুমান করিতে পারিল। সে কমলাকে বিশেষরূপে চিনিত। এই আত্মাভিমানী দৃপ্তা নারীকে সে শুধুই ভাল বাসিত না যথেষ্ট সম্ভ্রমের চোখে দেখিত, এমন কি ভয়ও করিত। তাই সে চিন্তিতা হইল। ব্যর্থ নিরাশার গ্লানিময় জীবনভার বহনে অক্ষম হইয়া শেষে আত্মঘাতিনী হওয়াই কি তাহার কপালে লেখা ছিল।

সে সংক্ষেপে উত্তর লিখিল—"ঠিক করেছিস্। পদ্ম পাঁকে জন্মালেও কারও চাইতে সে তুচ্ছ নয়। তুই বড় হয়েই এ জন্মেছিস্ এ কথায় বিশ্বাস রাখিস্। ভয় কি ভাই!" তোরই কানাকড়ি

(৬)

সুরেশ এবং কমলার মধ্যে সেই সকরুণ বিসদৃশ বিয়োগান্তক বিচ্ছেদের পর অনেক দিন এবং রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল। যদিও উভয়ে তাদের জীবনের সেই মর্ম্মান্তিক ঘটনাটিকে অতি সহজ সাধারণ এবং স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করিবার ভাণ করিয়া আসিতেছিল কিন্তু অন্তর্য্যামী জানেন তাহারা প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে কি ভাবে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইয়া যাইতেছিল।

তাই বহুদিন পর কমলার অপ্রত্যাশিত আহ্বানে সুরেশ অত্যন্ত বিব্রত

এবং বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। সে মনে অতিবড় কৌতুক এবং বিস্ময় বোধ করিল। অনেক চিন্তা করিয়া ঠিক করিল কিছুতেই সে কোনওরূপ কাপুরুষের মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিবে না। তাহার হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য কমলার সমক্ষে দীনহীন ভাবে প্রকাশ হইতে দিবে না। কাহাকেও অনাবশ্যক অপমানও যেমন করিবে না তেমনি অযথা অপ্রয়োজনে বাহুল্য সম্মানও সে করিবে না! সে তাহার নির্লিপ্ত ব্যবহারে কমলাকে তাহার নিজ অবস্থার কথা স্মরণ করাইয়া দিবে। সে স্থির করিল কমলার এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিয়া নিজকে কিছুতেই সে খর্ব্ব করিবে না। বরং এই সাক্ষাৎ জনিত তাহার কৃত দুষ্কার্য্যের ফলভোগ, দুঃসহ লাঞ্ছনা বেদনা সে মানুষের মতই সহ্য করিবে।

(৭)

সুরেশ কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া অসম্পর্কিত নীরস শুষ্ক কণ্ঠে কহিল, "তুমি কি আমায় ডেকে পাঠিয়েছ?" কমলা অবনত মুখে উত্তর করিল "হাঁ। কথা আছে।"

—"বল! কিন্তু খুব অল্প কথায়!"

—"যা হয়ে গেছে তার কোন কৈফিয়ৎ আমি দেব না। তা ছাড়া তার আর কোন প্রয়োজনও দেখি না।"

—"সেই ভাল! কথাটা কি?"

কমলা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তেমনি মুখ নীচু করিয়া নখ খুঁটিতে লাগিল। মুখে কিছুই বলিতে পারিল না। অনেক চেষ্টা করিয়া কহিল, "তুমি আমায় অনেক ভিক্ষা দিয়েছ, এই শেষবারের মত আমায়—" কথাশেষ করিতে না

দিয়া অসহিষ্ণুভাবে সুরেশ কহিল, "এই কথার জন্য! বেশ, তাহ'লে এখন আসি!"

সুরেশের এই ভাবহীন নির্লিপ্ত কণ্ঠস্বর, এই চিত্তস্থৈর্য্য, এই বাক্ সংযম —ইহার অন্তর্নিরুদ্ধ বিদ্রূপ কমলার বুকে ছুরির মত বিঁধিতে লাগিল। গমনোন্মুখ সুরেশকে বাধা দিয়া কমলা কহিল, "দাঁড়াও, যাক্, সব শেষ হয়ে গেছে। আর তোমায় মিছা-মিছি ধরে রাখ্‌তে চাই না। আমার এই শেষ মিনতি শেষ অনুরোধ।" কমলার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল। সুরেশ সহজ কণ্ঠে কহিল "সঙ্কোচ কি বল।" কমলা এক নিশ্বাসে কহিল "তুমি এখান ছেড়ে চলে যাও। এই কল্‌কাতা যত শীঘ্র পার ত্যাগকর।"

—"আমায় কল্‌কাতা ত্যাগ করতে হবে? কারণ?"

—"তোমার শত্রু অনেক। তা ছাড়া আমা হতে যার আরম্ভ, আমাকেই একাকী তার ফল ভোগ করতে দাও। অনর্থক মাঝে থেকে কাউকে এ জন্য আমি বিপদে ফেল্‌তে চাই না।"

—"তোমার উপযুক্ত কথা বটে! ধাপে ধাপে যতদূর নামবার নেমেছি। পরিণাম চিন্তা কোন দিন করি নাই। এখন আর তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। তবে এইটুকু বল্‌তে পারি—আমায় রেহাই দাও। আর না। আমার ভাল, আমার মন্দ, আমার পরিণাম আমাকেই ভাব্‌তে দাও। প্রাণের ভয়ে পিঠ্-টান্ দেবার এ অমূল্য উপদেশটুকু আমার জন্য ব্যয় না করে আর কারও জন্য শিকেয় তোলা থাক্‌লে বোধ হয় ভাল হ'ত। যাক্ এজন্য তোমায় আমি তেমন দোষও দিতে পারি না। যে যেমন দরের লোক তার মুখ্ হ'তে তেমন কথা বের হওয়াই সঙ্গত এবং স্বাভাবিক। তবে—" সুরেশকে আর কিছু বলিতে না দিয়া নিজকে বহু কষ্টে সামলাইয়া

নিয়া, কমলা কহিল—"থাম! তবে ত তুমি সব জান। কসাইরা ইস্পাতের ছুরি বসায়, কিন্তু যারা ভদ্রবেশ ধরে এতটুকু দয়া মমতা না দেখিয়ে—" সুরেশ ঔদাসীন্যভরে যুক্তকরে নাটকীয় ভঙ্গীতে কহিল, "মাপ কর কমলা! উপন্যাস নাটকে এ রকম কথা অনেক পড়েছি বটে কিন্তু এখানে এম্‌নি ভাবে দাঁড়িয়ে নাটক শুনি তেমন ইচ্ছা আর নেই।" কমলা সে কথা কানে না তুলিয়া অর্দ্ধ স্বগতভাবে মরণাতুর কণ্ঠে কহিল, "শোন, একদিন এক নারী তার সর্ব্বস্ব তোমার পায়ে লুটিয়ে দিয়েছিল। এত সহজে তুমি সে কথা ভুললেও, সত্য কিছু মিথ্যা হবে না। আমি সেই নারীর সেই জলন্ত প্রেমকে সাক্ষী রেখে বল্‌ছি, যে দুঃখের ভার এজন্য বইতে হচ্ছে সেই দুঃখ ব্যথার বিনি দাতা তাকে সাক্ষী রেখে বল্‌ছি, আর স্বর্গগতা তোমার মহিয়সী জননী—তুমি অন্ধ, তাই দেখতে পাচ্ছনা—যিনি অন্তরীক্ষ হ'তে তার দুই স্নেহ চক্ষুর দৃষ্টিতে সহস্র ধারায় আশীষ বর্ষণ করে এই মূর্চ্ছিত আত্মাকে উদ্বুদ্ধ বলীয়ান কচ্ছেন,—তার নামে বল্‌ছি, তুমি এই মুহূর্ত্তে এস্থান ত্যাগ কর। পালাও পালাও। যেখানে ইচ্ছা যাও—আমার কোনও বিধি নিষেধ নাই,—তবু আমা হ'তে দূরে, দূরে—বহু দূরে, যেখানে আমার নিশ্বাস সমস্ত নগরীর বাতাসকে দূষিত না করে, নইলে তুমি আমায়,—আমায় আবার আমাতে ফিরিয়ে আন্‌বে।"

—"হু, বুঝ্‌তে পারছি—দরদ কোন্‌ খানে!—নারী, একদিন নির্ব্বোধের মত কাজ করেছি ব'লে সত্যি আমি তত নির্ব্বোধ নই। তুমি ভয় পাচ্ছ তুমি এখন যার স্কন্ধে চেপেছো পাছে সে অতীতের কিছু জানতে পারে। এই যে দু'হাতে সে অর্থ লুটাচ্ছে, সে হাত ছাড়া হ'লে সবই বিফল। চমৎকার! হায় বেচারী সে,—দুঃখ হয় তার জন্য! একদিন তারও চোখ

খুল্‌বেই, কিন্তু সেই খোলা চোখে যে সে দৃশ্য দেখ্‌বে তখন তার বদন অনেক খানি ব্যাদন হবে বটে কিন্তু প্রতিকারের আর কোনও উপায়ই থাকবে না।"

সুরেশ অব্যবস্থিত-চিত্ত লোকের মত একটানা কথা কয়টা বলিয়া তাহার অসংলগ্ন কথায় সে নিজেই লজ্জিত হইল। কহিল—"এই যে আমি, সেই আমার মুখেও নীতিকথার বুক্‌নি—আর এই যে আমার সম্মুখে তুমি তোমার মুখেও প্রেমের অমৃত নিস্যন্দিনী বানী—মধুক্ষরে, মধুক্ষরে, আর আমার মত ঐ গোবেচারার মত বহু লম্বকর্ণ হতভাগ্য গৌড়জন আনন্দে বিভোর হয়ে সেই সুধা চাখে নিরবধি। বাঃ বাঃ, এমন উদাস হতাশ প্রেমিকায় মত,—মুখখানা কাল বৈশাখীর ঝড়ের মত ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে, যেন মনে হয়—শতকোটী বজ্র ঝঞ্ঝা এ বুকে তোলপাড় করছে। দোহাই তোমার! আমার দিকে অমন ক'রে চেয়ো না। কারণ তা'তে এখন তোমার কোনই লাভ নেই। এ চাহনি—যে তোমায় চেনে না—তার জন্য তুলে রেখে দাও, আখেরে কাজ দেখ্‌বে।"

—"কি বল! তোমার যাওয়া ঠিক? আজ না বুঝ্‌লেও একদিন বুঝ্‌বে—তোমারই ভাল'র জন্য বল্‌ছি।"

"আমার ভাল'র জন্য! হাসালে দেখ্‌ছি। আমার ভালতে মন্দতে সুখে দুঃখে কার কি যায় আসে? আমার মত কোটী লোক অনাহারে রোগে শোকে দৈন্যে দুঃখে প্রতিদিন পচে গলে—মরছে। তাহাদেরই মত যদি আমারও সেই চরম পরিণতি ঘটে তাতেই বা কার কি? মনে পড়ে? উপর্য্যুপরি কয় খানা চিঠিতে কি লিখেছিলে?—ভুল, মিথ্যা। আমায় ভুলে যাও। একজন সম্ভ্রান্ত বড় লোক আমায় দয়া করে আশ্রয়

দিয়াছেন। তিনি আমরণ আমায় সুখে স্বচ্ছন্দে রাখ্‌বেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমিও তাতে রাজী হয়েছি। এ সুযোগ অবহেলা করা আমার পক্ষে ঠিক হবে না। আর বিশেষ যখন আমার জন্য তিনি এতখানি কচ্ছেন।"

—"কি বল, যাওয়া ঠিক তো?"

—"এতখানি! এতখানি! একদিন আমিও এতখানির চেয়েও হয়ত কতখানি ছিলাম। না-না, তোমার দোষ নাই। যা সকলে ক'রে তুমিও শুধু তাই করেছো। সাধারণের অতিরিক্ত যে চায়—সে ঠকে। আমিও হয়ত তোমার কাছে তাই প্রত্যাশা করেছিলাম, তাই ঠ'কেছি। শুন্‌তে পাচ্ছি—আমায় নাকি খুন করবার চেষ্টা হচ্ছে—। মূর্খ সে জানে না—যে আমার বাঁচবার প্রয়োজন আছে।"

—তুমি ভুল করছো। তিনি তোমার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, এ বিষয় তিনি সম্পূর্ণ নিরপরাধ"।

—"কিন্তু সে যে তোমার সংশ্রবে এসেছে এই তার অমার্জ্জনীয় অপরাধ। মহামারী, মড়ক প্লেগ,এদের সংশ্রবে যে আসে—তার জীবন সংশয়।"

—"ঠিক সেই কথাই তো আমিও বল্‌ছি; এস্থান ত্যাগ কর। সে জন্য আমি দায়ী—যে শাস্তি হয় নিজ হাতে আমায় দাও—আমি মাথা পেতে নেবো।"

"বুঝতে পারছি।"

—"তুমি যা বুঝেছো—ঠিক তাই। রূপকে পণ্য করেছি—কি করবো বল। ঐ আমাদের জীবিকার উপায়। তুমি নিজের মুখেই তো আমাকে পথের ধূলার মাঝে বসিয়ে দিলে। যে এত তুচ্ছ, এত হেয়

এমন ঘৃণ্য, তার কোনও সংশ্রবে তোমার আসা সঙ্গত নয় বলেই বলছি। একবার তোমার বাপ, মা, ভাই, বন্ধু, আত্মীয় স্বজন তাদের কথা মনে কর। তারা তোমার মুখ চেয়ে কত আশা করে বসে রয়েছেন মনে কর, তারপর—তারপর এই রূপ-উপজীবিনীর, ঘৃণিতা, পতিতার স্মৃতি চিরদিনের মত মুছে ফেল। তুমি কলিকাতা ত্যাগ কর।"

সুরেশ কমলার মুখের দিকে বিমূঢ়ের ন্যায় চাহিয়া রহিল। শীকার যেমন করিয়া ভুজঙ্গিনীর প্রদীপ্ত চক্ষুর দৃষ্টির মোহে ধীরে ধীরে সেই দিকেই অগ্রসর হয়—তেমনি যেন কি যাদুমন্ত্রে মোহাবিষ্টের ন্যায় সে একেবারে অভিভূত হইয়া অগ্রসর হইয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিল—

"যেতে পারি এক সর্ত্তে।"

—"কি ?"

—"যদি তুমি আমার সঙ্গে যেতে রাজী হও।"

কমলা অপূর্ব্ব হাসি হাসিল।

"ছিঃ তুমি কি ক্ষেপেছো ?"

—"তাকি আজও বুঝতে পারলে না ? আমি এমন এক বিপুল সমুদ্রের তটভূমিতে দাঁড়িয়ে। নীচে নীচে অতল অসীম বারিধি গর্জ্জন,—স্থির অচঞ্চল, ধ্রুব মৃত্যুর আহ্বান। সম্মুখে আর পথ নাই, পথের রেখা মাত্র নাই। পেছনে ফেরা অসম্ভব। এই সঙ্কটে মুহূর্ত্তে তুমি আমায় বাঁচাতে পার। শুধু একবার আমায় বল—আমি হাত ধরে প্রলয় পয়োধির মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়্‌তে প্রস্তুত।"

কমল অপরিমিত সংযমের বর্ম্মে নিজকে আচ্ছাদিত করিয়া সহজ এবং স্বাভাবিক কণ্ঠে কহিল—"পাগল, তাও কি হয় ?" সুরেশ স্বপ্নাবিষ্টের

স্থায় অগ্রসর হইয়া কমলার মুখের দিকে চাহিয়া আবেগ জড়িত কণ্ঠে কহিল—"এ মুখ, এই চোখ এ যে আমার বড় চেনা। কমলা, বল, একবার বল সত্য হোক মিথ্যা হোক বল যাহা বলেছো যা আমায় বুঝ্তে দিয়েছো—সব মিথ্যা, সব ভুল। আমি তোমায়—"

কমলার পায়ের নীচ হইতে কঠিন মৃত্তিকার আশ্রয় যেন ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল কোটী জন্ম, অনন্ত জীবন এই এক মুহুর্ত্তের জন্য হেলায় দেওয়া যায়—কিন্তু তার আর উপায় নাই।

—"তোমার আমার মাঝে দুস্তর অপার সমুদ্র ব্যবধান।"

—"গণ্ডুষে সে সমুদ্র আমি শুষে ফেলবো। শুধু তুমি একবার বল।

—"না, আমিও মানুষ। প্রতারণা আমিও আর বার বার করতে পারি না। প্রতিজ্ঞা করছি তোমায় আমি ভুলবো, তোমার চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলবো। হা, আমি আমার কথা রাখবো। এই ঠিক এই ঠিক। এই সত্য; না, মিথ্যা, ছলনা, প্রতারণা, আর না। কথা দিয়েছি, প্রতিজ্ঞা করেছি, শপথ করেছি তোমায় ভুলবো।"

—"কমলা, কে সে? কার কাছে?"

—"এমন একজন একথা দাবী করবার যার অধিকার আছে।"

দ্ব্যর্থক কথার ভ্রান্তির তীব্র কষাঘাতে সুরেশের চেতনা লোপ পাইল। উন্মাদ ব্যাঘ্রের স্বরে সে কহিল,

—"সে তোমায় সেদিন কিনেছে ঐশ্বর্য্য দিয়ে উপযুক্ত মূল্য দিয়ে—হীরা জহরৎ দিয়ে কিনেছে।"

—"হুঁ।"

—"তবে বল তুমিও তাকে চাও। এই সত্য আর সব মিথ্যা।"

প্রস্তরীভূত কমলার কণ্ঠ হইতে তাহার অজ্ঞাত একটী অস্ফুট ধ্বনি বাহির হইল।

—"হুঁ।"

সুরেশ উন্মাদের মত দরজার দিকে অগ্রসর হইয়া পরিজনদিগকে আহ্বান করিতেই সকলে নিকটে আসিল। কমলা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কহিল ;

—"একি! কি তুমি করতে চাও।"

—"স্তব্ধ হও।"

সুরেশ উপস্থিত পুরপরিজন কৌতূহলী প্রতিবেশী দুই চার জন যাহারা উপস্থিত হইয়াছিল তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল,

এই স্ত্রীলোককে দেখছো?

সকলে সমস্বরে কহিল "হাঁ কমলা বিবি। কমলি বাঈ—"

—"হাঁ কমলাবাঈ, নর্ত্তকী, বাঈজী, রূপোপজীবিনী জানো একি করেছে?

—সকলে একবাক্যে কহিল—"না।"

—"হুঁ তবে শোন। একদিন সে নাকি আমায় ভাল বেসেছিল এবং সেই নজিরে তার বাড়ীঘর, গাড়ীঘোড়া, হীরা মুক্তা, তার শত সহস্র বিলাসের উপকরণ পরিত্যাগ করে, ছেড়ে দিয়ে কুলবধূর বেশে এক কাপড়ে আমার অনুগমন করেছিল। সেদিন আমি পিতৃপরিত্যক্ত নিঃস্ব ছিলাম। তার দিক থেকে যথেষ্ট সে করেছিল, কি বল? কিন্তু আমি কি করেছিলাম জান? কোন প্রতিদান না দিয়ে নির্ব্বিকার ভিক্ষুকের মত

তা গ্রহণ করেছিলাম। এতবড় অপদার্থ মনুষ্যত্বহীন আমি হয়ে পড়েছিলাম। আজ আমি আমার ভুল বুঝেছি। আর কৃত দুষ্কার্য্যের জন্য দুর্বিসহ আত্ম-গ্লানির আগুণে, তুষানলে জ্বলে পুড়ে মরছি। তবে এক সান্ত্বনা এই যে আজ আমায় ভগবান এই নারীর ইপ্সিত কাম্য প্রতিদানের সুযোগ দিয়েছেন। আজ আমি নিঃস্ব নই, বিপুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী। আমি আজ তাকে তার সেদিনের দয়া, সেদিনের কৃপার প্রতিদান দিতে সমর্থ এবং দিবও তাই। তোমরা আজ আমার সাক্ষী। আমি আজ তাকে তার সেদিনের অনুকম্পার দেনা সুদে আসলে সমস্ত ফিরিয়ে দেবো। আমার স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি বিক্রী করে যা হয়েছে আমি সমস্ত সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। আজ আমি এই ঘৃণ্য নারীর কাছে আর এক তিলও ঋণী নই। তার অনুকম্পার ঋণ, আমার বলতে যা কিছু আছে তার শেষ কণা পর্য্যন্ত দিয়েও নিঃশেষে শোধ দেবো।"

সুরেশ বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া উন্মাদের ন্যায় সহস্র সহস্র টাকার নোট, কম্পানীর কাগজ একটি পুটুলি হইতে বাহির করিয়া শূন্যে ছুড়িতে লাগিল এবং ঘরময় তাহা ছিন্ন-পক্ষ-পক্ষীর পালকের মত লুটাইয়া পড়িতে লাগিল। কমলা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। সুরেশ ঝড়ের মত ঘর হইতে তীরবেগে বাহির হইয়া গেল, আর পিছনে ফিরিয়া তাকাইল না।

সমাপ্ত।